ঝড়ের জোনাকি

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা পুস্তকালয় প্রাইভেট লিঃ
৩ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী
কলিকাতা পুস্তকালয় প্রাইভেট লিঃ
৩নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২

প্রিণ্টার
শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

দাম ২.০০

ঝড়ের জোনাকি

পরিচয়

স্বাধীন ভারতের মধ্যবিত্ত সমাজকে দুইটি জটিল সমস্যার ভারে এখনও ভারাক্রান্ত দেখা যায়। তাহাদের একটি বাসোপযোগী 'বাড়ী দেখা' এবং অন্যটি স্বীয় সংসারোপযোগী 'মেয়ে দেখা।' বাড়ীর সমস্যা অবশ্য বাড়ীওয়ালা বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিদের পক্ষে ততটা গভীর না হইতে পারে, কিন্তু কনে দেখার সমস্যাটি সকল সমাজেই জটিলতার সৃষ্টি করে। এমনই একটি সমস্যা ও তার বিস্ময়কর সমাধান সম্পর্কেই এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। 'মেয়ে বা কনে দেখা' এই সামান্য ঘটনাটি ঘটনাচক্রে কত বড় অসামান্য হইতে পারে, কাহিনীটি তাহারই পরিচায়ক।

বিখ্যাত 'উল্টোরথ' সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের 'সিনেমা-জগৎ' পত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যায় উপন্যাস খানি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। সে সময় পাঠক পাঠিকাগণ অযাচিত ভাবে পত্রিকা ও লেখক-সমীপে কাহিনীটির প্রশংসা করেন এবং কোনও বিশিষ্ট চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রূপায়ণের প্রত্যাশায় থাকেন।

লেখকের স্বয়ং সিদ্ধা, অপরাজিতা, নারীররূপ প্রভৃতি চিত্র-জগতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে এবং স্বয়ংবরা, রাগিণী, জন্মান্তরে, দময়ন্তী, বধূবরণ, প্রভৃতি রূপায়ণের প্রতীক্ষায় আছে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্রে এই পারিবারিক কাহিনীটিও জনমনোরঞ্জনের দাবী রাখে।

আর একটি কথা বইখানি যে কোন মঙ্গলানুষ্ঠানে উপহারের উপায়ন রূপে অকুণ্ঠ নির্বাচনের একান্ত উপযোগী!

বিনীত—প্রকাশক

পরম স্নেহাস্পদ, পরমাত্মীয়, প্রিয়বর

শ্রীহারাধন চট্টোপাধ্যায়ের

করকমলে

সি-আই-টি ভবন

ইণ্টালী : কলি-১৪

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

ঝড়ের জোনাকি

এই লেখকের সর্বাধিক প্রশংসিত উপন্যাস

"স্বয়ংসিদ্ধার"

অভিনব পরিকল্পনায় নবতম রূপায়ণ।

বিভিন্ন খণ্ডগুলির সার্থক সমন্বয়॥

এন্টিক কাগজে মুদ্রিত হইতেছে॥

উপহারে অনবদ্য উপায়ন

(১)

ব্যারাকপুর। ক্ষেত্রনাথের বাড়ির বৈঠকখানা।—ক'নে দেখার দৃশ্য।

তরুণ বিত্তশালী ভূস্বামী ও শিল্পপতি অবনিকান্ত কতিপয় বন্ধু সঙ্গে নিয়ে ক্ষেত্রবাবুর ভাগিনেয়ী সীমাকে দেখতে এসেছে। কিন্তু ক্ষেত্রনাথ এই মেয়ে দেখানো ব্যাপারে রীতিমত এক চালাকি করেছেন। সীমার মুখ-চোখ দেহ-সৌষ্ঠর প্রভৃতি সব কিছু নিখুত হলেও তার গায়ের রঙটা ফর্সা নয় বলে, ক্ষেত্রবাবু তাঁর বন্ধু তারকবাবুর সর্বাঙ্গসুন্দরী মেয়ে সুমিত্রাকে পাত্রপক্ষের সামনে হাজির করেছেন সীমার পরিচয় দিয়ে। তাঁর ধারণা, যদি অবনী একবারটি সুমিত্রাকে পছন্দ করে, তিনি বিয়ের রাতে মেক্-আপের সাহায্যে সীমাকে নির্বিকার চিত্তে চালিয়ে দেবেন। তারপর অবনীদের বাড়িতে গিয়ে যা হয় হবে।

সুমিত্রা শুধু রূপসী নয়—সবদিক দিয়ে চৌখস আধুনিকা মেয়ে। অবনী ও তার বন্ধুদের প্রতিটি প্রশ্নের চোখা চোখা উত্তর দিয়ে সকলকে চমৎকৃত করে দেয়—গানের কথা উঠতেই তৎক্ষণাৎ হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে একখানা আধুনিক গান গেয়ে শোনায়।

আর যে মেয়েটির স্থলে পাত্রী হয়ে বাইরের ঘরে পাত্রপক্ষের সামনে প্রক্সি দিচ্ছিল সুমিত্রা—সেই কালো মেয়ে সীমা বাড়ির ভিতরে নানান কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে কান পেতে বাইরের ঘরের গান ও সংলাপের অংশবিশেষ শুনতে শুনতে নীরবে শুধু দীর্ঘশ্বাস মোচন করছিল।

অবনী ও তার পার্শ্বোপবিষ্ট বন্ধুত্রয় সুমিত্রাকে খুবই পছন্দ করে। কিন্তু কিছুদূরে উপবিষ্ট প্রিয়বন্ধু অনিমেষ বরাবরই গম্ভীরভাবে নির্বাক থাকে। তবে বহু বহু পাত্রী দেখার পর এই পাত্রীটিকে অবনী পছন্দ করায়, সে অবস্থা বুঝে তুষ্ণিভাব অবলম্বন করে—যদিও সুমিত্রার

এতখানি বেপরোয়া ভাবভঙ্গি তার পছন্দ হয়নি। যাই হোক অবনী খুশী মনেই বিদায় গ্রহণ করে এবং ক্ষেত্রবাবুকে যাবার সময় বলে যায় যে, পাকা-দেখার তারিখটা সে শীঘ্রই জানিয়ে দেবে।

(২)

হাওড়ার সদরে—শহরের ওপর রায়পুর এস্টেট, ঝরিয়া কোলিয়ারি ও কতিপয় বিখ্যাত ফ্যাক্টরির মালিক শিল্পপতি উমাকান্তবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ি। একমাত্র পুত্র অবনীকান্তই এখন সম্প্রতি-স্বর্গত পিতার একমাত্র উত্তরাধি-কারী। সংসারে এখন অবনীর আপনজন ও অভিভাবিকা বলতে এক পিসিমা ভবসুন্দরী ছাড়া আর কেউ নেই। ইনি যেমন বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণা, তেমনি মহীয়সী মহিলা। বিহার প্রদেশে এঁর শ্বশুরবাড়ি এবং শ্বশুরকুলের সাক্ষীস্বরূপা ইনিই একমাত্র বর্তমান আছেন। এঁর বিশাল সম্পত্তি ও সঞ্চিত বিপুল অর্থ অবনী ও তার বধূকে দান করবার সংকল্প নিয়ে সাগ্রহে ইনি শুভ-বিবাহের দিনটির প্রতিক্ষা করছেন। এ-বাড়িতেও পিসিমা ভবসুন্দরী দেবীর অপ্রতিহত প্রতিপত্তি। এমন কি, যাবতীয় বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়িকাও ইনি। অবনীও জানে যে, পিসিমার ইচ্ছা বা সম্মতির বিরুদ্ধে তার করণীয় কিছুই নেই।

ব্যারাকপুরে মেয়ে দেখে এসেই অবনী পিসিমাকে জানায় যে, এ মেয়েটিকে সে পছন্দ করেছে ; মেয়ের মামাকে বলে এসেছে পাকা-দেখার দিন ঠিক করে জানাবে। সুতরাং এখন পিসিমা যা ভাল বোঝেন করুন।

পিসিমা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। এ পর্যন্ত অনেক মেয়ে দেখা হয়েছে, কিন্তু অবনীর পছন্দ কোথাও হয়নি। ব্যারাকপুরের মেয়েটিকে সে পছন্দ করায় তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। তাঁর দাদা —অবনীর পিতা উমাকান্ত অবশ্য ভগ্নির উপরেই ক'নে পছন্দের ভার দিয়ে যান। কিন্তু ভবসুন্দরী অনেক ভেবেচিন্তে শেষে অবনীকেই

বলেন : তুই নিজের চোখে দেখে মেয়ে পছন্দ কর, সেইটিই ভাল ব্যবস্থা। দরকার হয়, আশীর্বাদের দিন আমি যাব।

এরপর পিসিমা পুরুতঠাকুরকে খবর পাঠান—তিনি যেন পাত্রী আশীর্বাদের ভাল একটা দিন দেখে দেন।

(৩)

অবনীর বৈঠকখানায় আর সব বন্ধুরা এসে আসর জমিয়েছে। পুরুতঠাকুর এখনো পাকা-দেখার দিনটি ঠিক করতে পারেননি বলে নানারূপ মন্তব্য করছে। মেয়েদেখার পর চতুর্থ দিনের অপরাহ্ণ। এমন সময় বাড়ির বেয়ারা একখানা চিঠি এনে অবনীর হাতে দিল। চিঠিখানা এইমাত্র ডাকে এসেছে।

অবনী চিঠি খুলে উল্টেপাল্টে দেখে, মেয়েলী হাতের লেখা, চিঠির নীচে লেখিকার স্বাক্ষর নেই। এরপর চিঠির লেখাগুলি পড়তে পড়তে অবনীর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। বন্ধুরা নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

ক্ষুদ্র চিঠিখানা পড়ে অবনী বিমূঢ় হয়ে যায়। তবে কি সে যাকে দেখে এসেছে, সে সত্যিই ক্ষেত্রবাবুর ভাগ্নী সীমা দেবী নয়? এ কি দুঃসাহস লোকটার? অন্য এক রূপসী মেয়ে দেখিয়ে তাকে ঠকাবার মতলব করেছে আসল মেয়েটির মামা?

লেখিকা চিঠিতে জানিয়েছেন—"যাকে দেখে আপনি পছন্দ করেছেন, সে সীমা নয়—তার নাম সুমিত্রা। ৫নং নিউ বালিগঞ্জ লেনে তারা থাকে। সুমিত্রাও অবিবাহিতা, তাকে বিবাহ করতে আপনার অসুবিধা হবেনা। আর এ বিবাহ হলে এ ভদ্রলোককে মস্ত একটা মিথ্যাচার থেকে বাঁচাতে পারবেন।"

নিজের মনেই বিচার করতে থাকে অবনী—কে এই চিঠির লেখিকা? সুমিত্রা নিজে, না অন্য কেউ?

অবনী এর পর বন্ধুদের কাছে কথাটা খুলে বলতেই তারা বিস্ময়ে লাফিয়ে ওঠে। সমস্বরে সবাই নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করতে থাকে।

ঃ এখনি এই চিঠি নিয়ে এন্‌কোয়ারি করা উচিত।

ঃ যদি সত্যি হয়, লোকটার শাস্তির ব্যবস্থা করা চাই—

ঃ আজকের দিনে সমাজের বুকের ওপর বসে এত বড় একটা মিথ্যাকে সত্যি বলে চালাতে চায়!

ঃ লোকটার আস্পর্ধা ত, কম নয়! না, আর দেরী করা নয়— তোমার গাড়ি বার করতে বল, চল আমরা দল বেঁধে ঐ বাড়িতে চড়াও হই।

এমনি সময় অনিমেষ এসে কক্ষে প্রবেশ করে। বিস্ময়ের সুরে সে জিজ্ঞাসা করেঃ কি ব্যাপার, এতবড় ঘরখানা যে গরম করে তুলেছ—

অবনী অনিমেষকে ডেকে কাছে বসিয়ে চিঠির কথা বলে। অনিমেষ ঘটনাটার মোড় ঘুরিয়ে দেয়, বলে ঃ বেনামা চিঠি, ভাল করে তদন্ত না করে এভাবে উত্তেজিত হওয়া ঠিক নয়। এখন এ চিঠির কথা একেবারে চেপে যাওয়া উচিত। দু'একদিন অপেক্ষা করে দেখ, তারপর খুব সংযত হয়ে সন্ধান করতে হবে। পিসিমাকেও কথাটা এখন বলনা; তিনি ভারি ব্যথা পাবেন।

অনিমেষের যুক্তিই গৃহীত হয়।

(৪)

ক্ষেত্রনাথের বাড়ির সেই বৈঠকখানা। ক্ষেত্রনাথ বন্ধু তারকবাবুর সঙ্গে সেদিনের মেয়ে দেখানো ব্যাপার তাঁর কন্যা সুমিত্রা ও নিজের ভাগিনেয়ী সীমার সম্পর্কেই আলোচনা করছিলেন।

ক্ষেত্রনাথ ঃ ভালয় ভালয় অবনীবাবুর সঙ্গে সীমার বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর তোমার মেয়ে সুমিত্রাকে পার করবার দায়িত্ব আমার। ওর বিয়ের জন্যে নগদ দুটি হাজার টাকা আমি তুলে রেখেছি ভায়া।

তারকবাবু ঃ তুমি যে মতলব ফেঁদেছ দাদা, তাতে বিয়ের রাতটা পর্যন্ত সীমাকে চালিয়ে দেওয়া যাবে; কিন্তু তার পরের ব্যাপারটাই—

ক্ষেত্রনাথ ঃ সেটা আমি যে না বুঝেছি তা নয়। তবে মেয়েটা যদি অবনীকে সব বলে কয়ে হাত করতে পারে ত' কথাই নেই—রায়পুর এস্টেটের রাণী হয়ে বসবে। আর যদি সব গুলিয়ে যায়, অবনী সীমাকে ত্যাগ করে, তাহলেও আমার বা সীমার লোকসান নেই। মাসিক হাজার টাকা খোরপোষের দাবি করে মামলা জুড়ে দেব—নিদেন পাঁচশো টাকা কে খণ্ডায়! আরে, এই জন্যেই ত মেয়েটাকে কোন রকমে একবার ছাঁদনাতলায় দাঁড় করাবার জন্যেই আমার এত মাথাব্যথা।

ওদিকে বাড়ির ভিতরে ক্ষেত্রনাথের স্ত্রী মনোরমা শয়নকক্ষে খাটের ওপর বসে বিবাহিতা কন্যা রমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। ঘরের বাইরে অলিন্দে সীমা চায়ের সরঞ্জাম সব সাজিয়ে বসেছে। ঘর-গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজের উপর সকালে বিকালে নির্দিষ্ট সময়ে তাকেই চায়ের কাজ সারতে হয়। দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে সে ঘরের মধ্যে সেঁধুতেই মনোরমা বললেন ঃ বাইরের ঘরে বালিগঞ্জের তারক ঠাকুরপো এসেছেন। কর্তার চায়ের সঙ্গে তাঁর চা-ও দিয়ে এস।

হাতের পেয়ালা দুটি এ ঘরে হাতে হাতে সমর্পণ করে সীমা বেরিয়ে গেল। আরো দু'কাপ চা দু'হাতে নিয়ে সে বাইরের ঘরের দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল। ভিতরে তখন দুই বন্ধুর মধ্যে তাকে নিয়েই আলোচনা চলেছে। আলোচ্য কথাগুলি তার কানে আসে। দরজার বাইরে একটা উস্‌খুস্‌ শব্দ শুনে ক্ষেত্রনাথ সচকিত ভাবে উঠে পড়েন এবং ঝাঁ করে দরজাটা খুলতেই দেখেন, সীমা দাঁড়িয়ে আছে দু'হাতে দু' পেয়ালা চা নিয়ে।

মারমুখো হয়ে ওঠেন ক্ষেত্রনাথ ঃ হতচ্ছাড়া মেয়ে, এখানে দাঁড়িয়ে আড়ি পাতা হচ্ছে? কান ধরে একদিন রাস্তায় বের কর দেব—

সীমা প্রতিবাদ করেনা, ম্লান মুখে ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর চায়ের পাত্র দুটি রেখে আবার নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

ব্যাপারটা বুঝতে পারেন তারকবাবু। এই অহেতুক দুর্ব্যবহার সীমার প্রতি তাঁর অন্তরটি সমবেদনায় ভরে ওঠে। অস্পষ্ট দুটো শব্দ তাঁর মুখ দিয়ে অমনি বেরিয়ে আসে ঃ আহা—বেচারা!

কিন্তু তার অনুকূলে স্পষ্টাপষ্টি কিছু বলবার সাহস হয়না তাঁর। তারকবাবুর ওঠবার সময় ক্ষেত্রনাথ তার হাতে 'দশটাকার দু'খানা নোট দিয়ে বলেন ঃ উপস্থিত এটা রাখ, ভায়া।

নোট দু'খানা হাতে করে তারকবাবু ম্লান দৃষ্টিতে তাকান ক্ষণকাল নীরবে। তাঁর দৃষ্টি থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে—তিনি আরও বেশী কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন।

এই সময় ক্ষেত্রবাবুর ছেলে ভানু একটা স্যুটকেস হাতে করে বাড়িতে ঢোকে। ভানু ২২।২৩ বছরের সুদর্শন ছেলে, বেশ চালাক-চতুর। সরকারী অফিসে চাকরি করে, আবার ইভনিং ক্লাসে কলেজে পড়ে। বাড়ির মধ্যে এই ছেলেটিই সীমাকে স্নেহপ্রীতির দৃষ্টিতে দেখে, তার দুঃখকষ্টে সহানুভূতি জানায়। মেয়ে দেখার সময় ভানু অফিসের তরফ থেকে বাইরের একটা একজিবিসন দেখতে গিয়েছিল সহকর্মীদের সঙ্গে। বাড়িতে ফিরতেই সীমার সঙ্গে দেখা হয়। সীমা তাকে সকৌতুকে বলে ঃ তুমি বাইরে যেতেই হাওড়া থেকে মস্ত এক বড়লোক আমাকে দেখতে এসেছিল। কত কাণ্ড, কত খাই-দাই, তুমিই ফাঁক পড়ে গেলে দাদা।

প্রক্সি দিয়ে দেখার কথাটা সীমা চেপে যায়। ভানু বলে ঃ তাহলে ত' সুখবর।

(৫)

বাড়ি ফিরে তারকবাবু স্ত্রী নিরুপমাকে ক্ষেত্রনাথের অঙ্গীকারের কথাটা বলতেই, সুমিত্রার মা নিরুপমা বললেন: ক্ষেত্তরবাবুকে বিশ্বাস নেই। সীমার সঙ্গে অবনীর বিয়ে একবার হয়ে গেলে, তোমাকে সে একটা পয়সা ও ঠেকাবেনা।

তারকবাবু বলেন: হাতে দেদার টাকা থাকতেও লোকটার স্বভাবটাই হচ্ছে কিপটে, এই দেখনা, সেদিনের ব্যাপারে কুড়িটা মাত্তর টাকা ঠেকিয়ে বিদেয় দিলে। কিন্তু কি আর করা যায়। এ নিয়ে ত আর মামলা করা চলেনা।

নিরুপমা বলেন: মামলা করা না গেলেও, তার চেয়ে বেশী কিছু করা যায়। বলি, পরের মেয়েকে পাত্রস্থ করবার জন্য উনি ত' জাল-জোচ্চুরি করতে দ্বিধা করলেননা। কিন্তু এরপর নিজের মেয়েটার কি গতি হবে, সে কথা একবার ভেবে দেখেছ। সুমিত্রার কি বয়স হয়নি? তাকে চিরকাল আইবুড়ো রাখবে?

তারনাথ বলেন: জাল-জোচ্চুরি হলেও সীমার মুখ চেয়ে, তার আখের ভেবে আমি আপত্তি করিনি, ও মেয়েটার কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায়। ক্ষেত্রনাথ ও তার স্ত্রী, সীমার ওপরে যে কি অত্যাচার করছে, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায়না। রাতদিন, চব্বিশ ঘণ্টাই মেয়েটাকে ঝি চাকরের মত খাটায়। পরিবর্তে দুটো মিষ্টি কথাও নেই—পায় শুধু গালাগালি, অপমান। তাই আমি ভাবলাম বাপ-মা মরা মেয়েটাকে যদি কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারি। যদি সুমিত্রার সাহায্যে মেয়েটা পাত্রস্থ হয়। আর আমাদের সুমিত্রাকে পাত্রস্থ করবার কথা নিয়ে আমি একটুও ভাবিনা। সুমিত্রা সুন্দরী, নাচতে গাইতে জানে, কলেজে পড়েছে। তার মত আপ-টু-ডেট

মেয়ের জন্য ভাবনা কি। ভাল ছেলে আপনা থেকেই এসে জুটবে, আর যাতে জোটে তার ব্যবস্থা করতেও তো তুমি ছাড়নি।

মুখখানা বেঁকিয়ে নিরুপমা বলেন : ঐ আনন্দেই থাক। একটু চালাক-চতুর হতে শেখ। অমন হাঁদা-গঙ্গারাম হলে সংসার চলে কখনো ?

তারকবাবু মৃদু হেসে বলেন : তিনকাল যার যেতে চলেছে তার পক্ষে আর নূতন করে চালাক-চতুর হয়ে কাজ কি ? তুমি কি বলতে চাও, কি মতলব এঁটেছ—সেইটেই বলে ফেললেই ত হয়।

নিরুপমা বলেন : শঠে শাঠ্যং গো ! পাত্তরের কথা। ক্ষেত্রবাবু যেমন বড়লোক পাত্রকে ধাপ্পা দিয়ে কালিন্দী ভাগ্নীকে চালাবার চেষ্টা করেছে, তুমিও তেমনি ও মিনসেকে বেকুব বানাতে পার ত ? আমাদের সুমিত্রা তো আর কালো কুৎসিত নয়—তবে ?

তারক বলেন : তাহলে কিন্তু ওদিনের কনে-দেখানোর ব্যাপারটা জানাজানি হবে, আর সুমিত্রা ঐ জোচ্চুরি ব্যাপারের মধ্যে ছিল বলে বড়লোক মেজাজী পাত্র সুমিত্রার ওপরেও চটে যেতে পারে। মাঝখান থেকে সীমা মেয়েটারও গতি হবেনা। এর পর ক্ষেত্তরের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্কটাও ছিঁড়ে যাবে। তাতে আমারই ক্ষতি, দায়ে ঘায়ে তার কাছ থেকে দু-দশ টাকা যা ধার পাই, তাও বন্ধ হবে।

নিরুপমা বলেন : তুমি একটা আহাম্মক। চালাক-চতুর হলে এমন দাঁও ছাড়তে না। যা করবার আমাকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি। আচ্ছা, ঠিক করে বলত—সুমিত্রাকে ঐ বড়লোক পাত্র সত্যি সত্যিই পছন্দ করেছিল কিনা ?

তারক মাথা নাড়েন : হ্যাঁ। পছন্দ না হলে পাকা-দেখার কথা বলে যায় ? কিন্তু তুমি এ নিয়ে কি করতে চাও শুনি ?

গম্ভীর হয়ে নিরুপমা বলেন : কি করা যায় তাই ভাবছি।

(৬)

সুমিত্রা ছাড়াও তারকবাবুর আরো দু'তিনটি ছেলেমেয়ে আছে। স্ত্রী নিরুপমা শিক্ষা দীক্ষায় রুচিতে সেকেলে হয়েও আধুনিকা সাজবার জন্য সচেষ্ট। তাঁরই শিক্ষাতে সুমিত্রা আজ একটা সোসাইটি গার্ল হয়ে উঠেছে।

আধুনিকা রূপসী সুমিত্রার অনেক বন্ধু-বান্ধব। সুমিত্রাকে তারা সাধ্য অনুযায়ী এটা ওটা নানা বস্তু উপহার দেয়। ভক্তদের সেই সব উপহার গ্রহণ করতে সুমিত্রার যেমন আপত্তি নেই, তেমনি বাইরের অনাত্মীয় তরুণদের এভাবে গায়ে পড়ে উপহার দেওয়া এবং কন্যার তাহা গ্রহণ করায় মা-ও বাধা দেননা, বরং খুশী মনে নানা প্রশ্ন করেন, কে কোন্‌টা দিয়েছে, সেই সঙ্গে দাতার নজর ও পছন্দ নিয়ে মন্তব্য করতেও বাধেনা। ফলে সুমিত্রার আস্কারা বেড়ে যায়। তারকবাবুর আপত্তি থাকলেও স্ত্রীর ভয়ে মুখ ফুটে তিনি কিছু বলতে ভরসা করেন না। সকাল-সন্ধ্যা সুমিত্রার ভক্তরা এসে তারকবাবুর বসবার ঘরে ভাঙা টেবিল-চেয়ারে আড্ডা জমায়। মা আশা করেন একদা এক রাজপুত্র ছদ্মবেশে এই দলে আসবে, তাঁর মেয়েকে বরণ করতে। কিন্তু রাজপুত্র আর আসেনা। সেদিন স্বামী-স্ত্রীতে যখন উপরোক্ত কথা হচ্ছিল তখন সুমিত্রা বসবার ঘরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল। বন্ধুদের একজন—নাম তার অমল, কোন এক ফিল্ম ম্যাগাজিনের রিপোর্টার। সে সুমিত্রাকে ফিল্মে নামাতে চায়। নিজে একখানা ছবি পরিচালনা করবার উদ্দেশ্যে ধনী খুঁজে বেড়াচ্ছে। সম্প্রতি অবনীনাথ নামে একজন বিত্তবান ধনী লোকের খবর পেয়েছে। সন্ধান নিয়ে জেনেছে এই বড়লোকটি শুধু বনেদী জমিদার নন, কলকাতায় ও হাওড়ায় এর বিশ পঁচিশখানা বড় বড় বাড়ি ভাড়া খাটে, তিন চারটে কোলিয়ারি, মস্ত একটা ফ্যাক্টারিরও মালিক ইনি। এঁর

আর্থিক অবস্থা এত ভাল যে এক চেকে তিনি এক লাখ টাকা স্বচ্ছন্দে দিতে পারেন।

নামটা শুনে চমকে উঠে সুমিত্রা বলে : অবনীবাবু! হাওড়ায় যাঁর বাড়ি, তাঁর কথা বলছেন ত'?

অমল বলে উঠল হ্যাঁ-হ্যাঁ। আপনি চেনেন নাকি তাঁকে? টাকার কুমীর ভদ্রলোক। রায়পুর এস্টেটের মালিক।

সুমিত্রার চোখদুটো জ্বলে ওঠে। সীমার প্রক্সি দিতে গিয়ে রায়পুর এস্টেটের এই নবীন মালিকটিকে সে ভাল করেই দেখেছে, আর মনে মনে জেনেছে যে ঐ টাকার কুমীরটি তার রূপমুগ্ধ। কিন্তু তিনি যে টাকার কুমীর, আর সিনেমার প্রতি অনুরাগী—আজ সে প্রথম জানলো। মার মত সুমিত্রারও টাকার ওপর বেজায় লোভ। অবনী যে সুপুরুষ সে তো জানা গেছে, তার ওপর বিদ্বান, টাকার কুমীর ও সিনেমার প্রতি অনুরাগী শুনে সুমিত্রা সেই দিনই তাকে একটা প্রেমপত্র লিখে বসলো। পত্রে সে একথাও লিখলো যে, ক্ষেত্রবাবু তার বাবার বন্ধু, তাঁর একান্ত অনুরোধে, তার কুৎসিত ভাগ্নী সীমা মেয়েটিকে পাত্রস্থ করবার ষড়যন্ত্রে যদিও সে যোগ দিয়েছিল, এ তার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। তখন দায়ে পড়ে রাজী হলেও, এখন সে অনুতাপে জ্বলেপুড়ে মরছে—এমন একটা নামী গুণী দেবতুল্য পুরুষের জীবনটা বিষিয়ে উঠবে বলে। তাই সে অকপটে কথাটা জানিয়ে দিল। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে এ ব্যাপারটা তার পক্ষে শাপে বর হতেও পারে! এ থেকে তাদের বন্ধুত্বের সৃষ্টি হওয়াও আশ্চর্যের বস্তু নয়। যদিও তার বাবা তারকবাবু বিশেষ অবস্থাপন্ন নন, কিন্তু তাদের পরিবার কৃষ্টিসম্পন্ন, আধুনিক ও মার্জিতরুচি। সুমিত্রা যদি অবনীর সঙ্গে মেলামেশা করে, সুমিত্রার মা-বাবা এতে আপত্তি করবেন না। আর যদিও বা আপত্তি করেন, সে শুনবে কেন? অবনীর জন্য বাড়ির সঙ্গে সকল সংশ্রব ত্যাগ করতেও সুমিত্রা প্রস্তুত। এমন কি দুনিয়ার সঙ্গেও সে সংশ্রব ত্যাগ করতে পারে।

এইভাবে ভনিতা করে লেখার পর উপসংহারে সুমিত্রা লিখছে : আসছে শনিবার বিকাল বেলায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নীচে সে অবনীর জন্য অপেক্ষা করবে।

(৭)

সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বিকেলবেলায়, অবনী বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছিল, এমন সময় চাকর নিয়ে এল ডাকের চিঠি। সেই চিঠি পড়ে অবনীর চক্ষুস্থির।

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করে : চিঠি আবার কে লিখলে? বেনামা নয়ত?

এক নিশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে অবনী উত্তর দেয় : সেদিন আমরা যে মেয়েটাকে দেখে এসেছি, তার চিঠি। আর সেদিনের বেনামা চিঠির কথা যে সত্যি—এই চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে।

বন্ধুদের মুখ থেকে বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন ওঠে : বল কি! কেউ বা চিঠিখানা দেখবার জন্য ব্যগ্রভাবে হাত বাড়ায়।

কিন্তু অবনী চিঠিখানি পকেটে ফেলে বলে : থাক! এখনি ওটা দেখে কাজ নেই।

বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে : মেয়েটা বোধহয় তোমাকে প্রেমপত্র লিখে বসেছে? রূপ দেখেই মজে গেছে।

অবনী হেসে বলল : অনেকটা তাইত মনে হচ্ছে।

একটু গম্ভীর হয়ে এক বন্ধু বলে : চিঠিতে এমন কি গোপন থাকতে পারে যা আমরা দেখতে পারিনা?

অবনি মিষ্টি হাসে, উত্তর দেয়না।

বন্ধু বলে : তাহলে হুকুম কর আমরা গিয়ে শ্রীমতি সীমার মামীর সঙ্গে বোঝাপড়া করে আসি।

অবনী বলে : দুটোদিন সবুর করো, ভেবে দেখি!

বন্ধুদের একজন ঠাট্টা করে বলে ওঠে: সবুরে মেওয়া ফলে।

আর একজন বন্ধু বলে: তাহলে ক্ষেত্রবাবুর ব্যাপারটা কদ্দিন ঝুলিয়ে রাখবে?

অবনী বলে: আমি ভাবছি লোকটাকে নিয়ে কি করা যায়—জেলে যাবার পথ সে নিজের হাতে তৈরী করে রেখেছে।

বন্ধুরা যেমন আকাশ থেকে পড়ে। বিস্ময়ের সুরে বলে: একি বলছ তুমি?

অবনী দৃঢ় হয়ে জানিয়ে দেয়: ওর ভাগ্নী কালো কুৎসিত বলে তাকে দাবিয়ে রেখে সে এই মেয়েটাকে তার জায়গায় প্রক্সি দেবার জন্যে আনিয়েছিল, বুঝলে?

তখন এ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা হয়। কেউ বলে: বেটাকে সত্যই জেলে দেওয়া উচিৎ। কেউ বলে: বেটার মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে রাস্তায় ছেড়ে দিতে হয়।

অবনীর অন্তরঙ্গ বন্ধু অনিমেষ এতক্ষণ একখানা খবরের কাগজ নিয়ে পড়ছিল, অবশ্যি মাঝে মাঝে মুখ তুলে এদের সংলাপ শুনছিল স্বয়ং নির্বাক থেকে। এই সময় সে সংযত স্বরে বলে: এসব সেকেলে শাস্তি। চল আমরা সব দল বেঁধে ওর বাড়ি গিয়ে সীমাকে দ্বিতীয়বার দেখবার জন্য পীড়াপীড়ি করি। তখন তার জোচ্চুরি হাতেনাতে ধরা পড়বে। আর আমরা ওরই বাড়িতে বসে ওকে অপমান করবো!

অবনী অনিমেষের কথায় সায় দেয়: হ্যাঁ, এ যুক্তি মন্দ নয়। তাই করতে হবে। তবে দিন কয়েক পরে। এ ক'দিন একটা বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে!

সে রাত্রে খানিক পরে আর সকলে চলে গেল অবনী অনিমেষকে গোপনে সুমিত্রার চিঠিখানি দেখায়।

চিঠি পড়ে অনিমেষ গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করে: তুমি কি তাহলে সত্যিই সুমিত্রার সঙ্গে দেখা করতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পার্কে যাবে?

অবনী বলে ঃ ভাবছি ! এতে তোমার কি মত, জানতে পারি ?

অনিমেষ জানায় ঃ এ ধরনের রোমান্স সৃষ্টি করতে আমি মোটেই রাজী নই। তা ছাড়া, গোটা চিঠিখানিতে একটা কৃত্রিমতার সুর রয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। অবশ্য নিজের ভালমন্দ বোঝবার মত যথেষ্ট বিদ্যা-বুদ্ধি তোমার আছে। তবে বন্ধু হিসাবে আমি তোমাকে এইটুকু বলবো, হঠাৎ যেন সুমিত্রার ব্যাপারে কিছু না করে বস। এটা মনে রেখো, রোমান্স বা আধুনিক ভালবাসার সঙ্গে বিয়ের আকাশ-পাতাল তফাৎ। যাকে তুমি সারা জীবনের জন্য গ্রহণ করতে যাচ্ছ,—ভালবাসার কথাই যখন উঠেছে, তাকে যাচাই করে নেওয়াই উচিৎ। কথাগুলি ধীরে ধীরে বলে অনিমেষ চলে যায়।

অনিমেষ চলে গেলে, অবনীর পিসিমা, পাকা-দেখার তারিখ সম্বন্ধে বলেন, অবনীর মত চান।

অবনী পিসিমাকে জানায়, এখন সে বিয়ে করবেনা !

শুনে পিসিমা আকাশ থেকে পড়বার মত হয়ে কান্নাকাটি শুরু করেন। অবনী তাঁকে কথা দেয়—এখনি কিছু না করলেও, এই বছরের ভেতরই সে বিয়ে-থার ব্যাপারটা সেরে নেবে।

পিসিমা চলে গেলে, অবনী প্রথম চিঠিখানির সঙ্গে সুমিত্রার চিঠি পাশাপাশি রেখে পরপর দু'খানি চিঠি পড়ে। দুটো চিঠিতে, দুই লেখিকার মানসিক গঠন, রুচি ও প্রকৃতির পরিচয় প্রকৃষ্ট পাওয়া যায়। সুমিত্রা চঞ্চল, সে অবনীকে পাবার জন্য যা খুশী করতে পারে ! কারণ অবনীর টাকা তাকে আকৃষ্ট করেছে, প্রেমে পড়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু প্রথম চিঠিটার লেখিকা কে ? তবে কি সীমা লিখেছে ? কিন্তু কোন মেয়ে নিজে নিজের সর্বনাশ এভাবে করতে পারেনা বলেই অবনীর ধারণা। চিঠি দু'খানি সযত্নে নিজের দামী হ্যাণ্ডব্যাগের ভেতর রাখে অবনী।

ক্ষেত্রনাথের সংসারে পিতৃ-মাতৃহীনা ভাগ্নী সীমা, একাধারে পাচিকা ও ঝি। রান্না-বান্না, বাসনমাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে বাড়ির সব কাজ তাকেই করতে হয়। সীমা এই সংসারে আসার পর থেকে ক্ষেত্রনাথের স্ত্রী মনোরমা কুঁজো থেকে নিজের হাতে একগ্লাস জলও গড়িয়ে খাননি কখনো।

সেদিন কলতলায় সীমা বাসন মাজছিল। মনোরমার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। সীমাকে কখন তিনি বলেছেন একগ্লাস জল দিতে। পোড়ারমুখা, হতভাগী ইত্যাদি সম্ভাষণে তিনি বাড়ি গরম করে তুলেছেন। ভান্নু ছুটে এসে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দেয় মাকে।

মা তখন পালঙ্কে বসে ঝিমোচ্ছিলেন। জলের গেলাস হাতে করে একপ্রস্থ সীমার মুণ্ডপাত করে বলেন : তুই কেন জল দিতে এলি ?

ভান্নু বলে : সীমা বাসন মাজছে। রান্না-বান্না এখনও কিছু হয়নি। বাসন মাজার পর তাকে রাঁধতে হবে, কিন্তু বাসন মাজতে মাজতে তোমার ফরমাস খাটতে গেলে দেরি হয়ে যাবে, তাহলে অফিসের ভাত কখন হবে ? না খেয়েই অফিস যাই এই কি তোমার ইচ্ছা ?

আগেই বলা হয়েছে, ভান্নু দিনে কোন সওদাগরি অফিসে চাকরি করে এবং রাতের ক্লাসে কলেজে কমার্স পড়ে। বাড়ির মধ্যে এই ছেলেটি সীমার দুঃখে দরদী ও সহানুভূতিতে অটল। মনোরমা কিন্তু সীমার দোষটাই দিলেন। বলেন : যে মেয়ে রাঁধে, সে কি আর চুল বাঁধেনা ? ভান্নুর বোন, মনোরমার বড় মেয়ে, রমা এসে মনোরমার সঙ্গে যোগ দেয়। ভান্নু বোনকে বলে : তুমি কোন্ রাজকর্মে ব্যস্ত ছিলে,—নভেল পড়া বন্ধ রেখে মায়ের ডাকে জলটুকু দিলেই পারতে ! মা ও মেয়ে একসঙ্গে ভান্নুকে যা-তা বলতে থাকেন।

ভানু সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। সীমা সে সময় কলতলা থেকে বাসনের ঝাঁক নিয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছিল। ভানু এসে তাকে দুটো সহানুভূতির কথা বলে। সবার অনিচ্ছায় সে সীমাকে পড়ায়। এখন তার ইচ্ছা—সীমাকে কোন স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে সেখান থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটি দেওয়ায়। সীমাকে বলে : তোমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার কথা বাবাকে আজই বলবো। কুছপরোয়া নেই। মাইনে-পত্র, বইয়ের দাম সব না হয় আমিই দেব। ভানুর বিশ্বাস সীমা চেষ্টা করলেই ম্যাট্রিকে জলপানি পাবে।

ম্লান হেসে সীমা বলে : কিন্তু বাড়ির কাজকর্ম কে করবে দাদা ?

ভানু : কেন, ঝি-ঠাকুর-চাকর রাখবে ওরা। তা বলে তোমার পড়া হবে না ?

সীমার ম্লান হাসি মিলিয়ে যায় মুখে। বলে : তাতে অনেক খরচ। ঘাড়ে-পড়া ভাগ্নীর জন্যে মামা এত খরচ করবেন ?

ভানু বলে : না হয়, আমিই সে খরচ জোগাব—একটা ভাল দেখে টিউশনি জোগাড় করে নেব।

সীমা বলে : সারাদিন অফিসে খাট, রাতে কলেজে কমার্স পড়। এর ফাঁকে আমাকে পড়াচ্ছ। শরীরকে আর কত খাটাবে দাদা ?

ভানু এই বাপ-মা-মরা মেয়েটাকে নিজের বোনেদের চেয়েও বেশী ভালবাসে। এমন মিষ্টি স্বভাব, এমন কর্মঠ, বুদ্ধিমতী মেয়েটার কিনা শেষকালে এই অবস্থা।

(৯)

সেদিন বিকেল বেলায় ক্ষেত্রনাথ অফিস-ঘরে বসে হিসেবের খাতা দেখছিলেন। এমন সময় ভানু সেখানে এসে সীমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার কথা বলে। এই নিয়ে পিতা-পুত্রে কথা কাটাকাটি হয়। তিনি স্পষ্টই জানান, এ সব ঢং এ বাড়িতে চলবে না। সীমার

বিয়ের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। এ বাড়িতে এতদিন আইবুড়ো অবস্থায় আছে, ওকে গতর খাটিয়ে খেতে হবে।

কুম্ভীরাশ্রু নিক্ষেপ করতেও কসুর করেন না। সীমকে পাত্রস্থ করবার জন্য তিনি কি না করেছেন : জানিস, কি রকম বড় ঘরে ওকে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছি, মস্ত জমিদার তারা। তার ওপর কোলিয়ারি আছে, বড় বড় কারবার চালায়। নিজে দেখতে এসেছিল। তুইত তখন বাইরে গিয়েছিলি, জানবি কি করে ?

কিন্তু ভানু যদি জমিদার পাত্রটির নাম জানতে পারত, তাহলে হয়ত ব্যাপারটা অন্যরকম হোত। তার কারণ অবনীর সঙ্গে ভানুর পরিচয় আছে। তারা একই কলেজে পড়াশুনা করেছে।

: তাহলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। নিজের চোখে পাত্র না দেখলে আর স্বকর্ণে সব না শুনলে আমার বিশ্বাস হয় না।

ক্ষেত্রনাথ ক্রোধ সামলাতে না পেরে ভানুকে মারবার জন্য তেড়ে যান। স্ত্রী মনোরমা ও কন্যা মায়া ছুটে এসে থামান।

(১০)

নির্ধারিত দিনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে অবনীর জন্য অপেক্ষা করে করে সুমিত্রা বিরক্ত হয়ে ওঠে অবনী আসে না। ভাবে অবনী কি তার চিঠি পায় নি। এমন সময় একদল অবাঞ্ছিত বন্ধু এসে তাকে ঘিরে ফেলে। এরা সুমিত্রার জন্য পাগল, কিন্তু সুমিত্রা এদের পছন্দ করে না। কারণ এরা বড়ই কুরুচিশীল। সুমিত্রা কৌশল করে আঙুর নামে একটা হুল্লোড়ে মেয়ের নাম করে। বলে : তারই সঙ্গে এখানে সে এসেছে, কিন্তু, সে কি একটা দরকারে ভিক্টোরিয়া হলে গেছে—এখনো পর্যন্ত ফেরবার নাম নেই।

আঙুরের নাম শুনে ছেলেরা লাফিয়ে ওঠে, আঙুরের সঙ্গে

সুমিত্রাকে পেলে ফুর্তি খুব জমবে। অবাঞ্ছিত বন্ধুরা আঙুরকে খুজতে যায়। ইতিমধ্যে সুমিত্রা অদূরে বড় রাস্তা লক্ষ্য করে ছুটতে থাকে।

(১১)

এদিকে গাড়ি নিয়ে অবনী সুমিত্রার বাড়িতে আসে। চিঠিতে সে বাড়ির ঠিকানাও দিয়েছিল। অবনীর ইচ্ছা তারকবাবুকে সীমার কথা জিজ্ঞাসা করবে, এই প্রতারণার উদ্দেশ্যটা কি সে জানতে চায়। কিন্তু তার মনের গহনে সুমিত্রাকেও সে একবারটি দেখতে চায় বই কি।

তারকবাবু বাড়ি ছিলেন না। সুমিত্রার মা নিরুপমা অবনীকে পেয়ে হাতে আসমান পান, যত্ন করে তাকে বাইরের ঘরে বসালেন।

তিনি বললেন : কর্তা এখুনি আসবেন। বসো, চা খাও বাবা। ছোট মেয়ে শীলাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন সুমিত্রা কোথায় গেল। হতভাগা মেয়ে! যার তার সঙ্গে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে। এদিকে অতবড় মানী লোকটা যদিই বা বাড়ি বয়ে এল, এখন তাকে না দেখেই চলে যাক আর কি!

ইতিমধ্যে সুমিত্রা এসে পড়ে। বাইরের ঘরে ঢুকেই অবনীকে দেখে তার বিস্ময় ও আনন্দের সীমা থাকে না। দু'জনেই পরস্পরের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। প্রথম প্রেমের মিষ্টি কথাবার্তা। সুমিত্রা নিজে হাতে অবনীকে চা করে খাওয়ায়। সুমিত্রার মা ও ছোট বোন আড়ি পেতে ওদের কথাবার্তা শুনে খুশী হন। যাবার সময় হলে সুমিত্রা সঙ্গে গিয়ে অবনীকে গাড়িতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে : আবার কবে আসছেন?

সেলফ্-স্টার্ট দিতে দিতে অবনী বলে : আসবো।

ঘরে ফিরে এসে সুমিত্রা খুশীতে ঘুরপাক খেয়ে নাচতে শুরু করে

দেয়, নাচের সঙ্গে একটা গানও সুর করে ধরে। এই সময় মা আসতেই তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে। দু'জনে হাসতে সুরু করেন। বিজয়ের হাসি। এতদিনে তাদের সাধনা সিদ্ধ হল। রাজপুত্র এসেছেন সুমিত্রার জীবনে।

সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে তারকবাবু সব কথা স্ত্রীর মুখে শুনে খুশী হন। রায়পুর স্টেটের মালিক অবনী উপযাচক হয়ে সুমিত্রার পাণি-প্রার্থনা করতে এসেছে। এর চেয়ে খুশীর কথা আর কি হতে পারে! কিন্তু ক্ষেত্রনাথ যদি জানতে পারে। তিনি তাহলে স্পষ্টই বুঝবেন, এতে তার কোন হাত ছিল না। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, নৈলে অবনী বাড়ি বয়ে সুমিত্রার সন্ধানে আসবে কেন? তিনি তো আর অবনীকে বাধা দিতে পারেন না। কিন্তু ক্ষেত্রনাথ বিশ্বাস করবে ত'। না-ই বা করল। তিনি কোন পরোয়া করেন না।

(১২)

ব্যারাকপুর। ক্ষেত্রনাথের বাড়ি।

রান্নাঘরের দাওয়ায় ভানু সীমাকে পড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে সীমা উঠে গিয়ে ভাত ফুটছে কিনা দেখে আসে।

ভানু বলে: বাবা যাই বলুন না কেন, আসছে বারে যাতে তুমি প্রাইভেট ম্যাট্রিক দিতে পার আমি তার ব্যবস্থা করবোই।

মনোরমা কথাটা শুনতে পেয়ে দরজার কাছে এগিয়ে এসে বলেন: তাহলেই দশটা হাত ওর বেরুবে—সিঙ্গি চড়ে ধিঙ্গী হয়ে বেড়াবে! যত সব অনাসৃষ্টির কথা। পড়ার পয়সা জোগাবে কে?

গলায় জোর দিয়ে সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে শক্ত হয়ে ভানু বলে: আমাকেই জোগাতে হবে। টুইশনি করে টাকা উপায় করে আমি ওকে পড়াব। কেন সে এই সংসারে সারাজীবন দাসীবৃত্তি করবে। অনাথা পেয়ে তোমরা মেয়েটার ওপর চূড়ান্ত অত্যাচার চালিয়েছ। আর নয়—আমি এ হতে দেবনা।

এই নিয়ে বিতর্ক ক্রমে তুমুল কলহে পরিণত হয়। ক্ষেত্রনাথ বাড়িতে আসবামাত্র মনোরমা ঝগড়ার কথা বাড়িয়ে অতিরঞ্জিত করে তাঁকে শুনিয়ে দেন। বললেন : হতভাগা ছেলেটাকে পর্যন্ত গুণ করেছে।

ক্ষেত্রনাথ তর্জন করে বললেন : জানি, সব জানি। সেদিন ভেনো আমার মুখের ওপর ছ্যারছ্যার করে কত কথাই শুনিয়ে দিলে। ঘরের ছেলে এখন ছুষমন হতে চলেছে।

ছোট মেয়ে ছায়া এসে বলল : সীমাদি রাগ করে বই খাতা সব তার তোরঙ্গে তুলে রেখেছে, বললে, আর লেখাপড়া করবেনা।

ক্ষেত্রনাথ স্ত্রীর দিকে তাকালেন। স্ত্রী বিকৃত কণ্ঠে বললেন : ওসব আথিখ্যেতা—ঢং !

ওদিকে ভানুর ঘরে ছু'জনে কথা কাটাকাটি চলেছে।

সীমা : না দাদা, আমার জন্যে কেন তুমি মা-বাপের মুখনাড়া খাবে ? আমি আর পড়বনা।

ভানু : তা হয়না, পড়া তুমি ছাড়তে পারবেনা ; তাহলে অন্যায়কে মেনে নেওয়া হবে। লেখাপড়া শেখা ত' অন্যায় নয়, তাতে তুমি যখন সংসারের সব কাজকর্মের মধ্যে থেকেই ওটা চালিয়ে যাচ্ছ।

সীমা : কিন্তু ওঁরা যে তা বুঝতে চাননা, আমাকে বই নিয়ে বসতে দেখলেই আগুন হয়ে ওঠেন। তাই এখন ভাবি, ছোট বয়স থেকে এনে আশ্রয় দিয়ে খাইয়ে দাইয়ে যখন বড় করে তুলেছেন, আমার উচিৎ নয় ওঁদের অবাধ্য হওয়া।

ভানু ক্রুদ্ধ হয়ে তীক্ষ্নস্বরে বলে : ওসব নীতিকথা ছাড়। তোমার জন্যে ওঁরা যা করেছেন তুমি তার ঢের বেশী করেছ, এখনো করছ। ছু'বেলা ছু'মুঠো খেয়ে ঝি-চাকর রাঁধুনীর কাজ করে চলেছ। অথচ তাদের যেটুকু স্বাধীনতা, তোমার তাও নেই।

গাঢ় স্বরে সীমা বলে : তাদের যে মাথা রাখবার একটা ঠাঁই থাকে দাদা, কিন্তু আমার ত' কিছুই নেই, তাড়িয়ে দিলে রাস্তায় গিয়ে

দাঁড়াতে হবে। তার ওপর প্রায়ই বলেন—বাবার একরাশ দেনা ঘাড় পেতে নিয়েছেন, একথা শুনলেই আমি যেন কেমন হয়ে যাই। অথচ ভাবতে বসলে স্বপ্নের মত মনে পড়ে—কত কি!

অভিভূতার মত ভাবার্দ্র স্বরে সীমা বলে যায়ঃ মস্ত বড় বাড়ি··· লোকজন···চাকর দাসীর কোলে পিঠে আমি···সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছি বাপ-মার কোলে। বলতে পার ভাণুদা—একি স্বপ্ন!···

এমন ভাবার্দ্র কণ্ঠে সীমা কথাগুলি বলে, তন্ময় হয়ে তার পানে তাকিয়ে শুনতে থাকে ভানু।

ভানুর পীড়াপীড়িতে সীমার পড়া ত্যাগ করা হয়নি। তোরঙ্গ থেকে আবার বই-খাতা বার করে রান্নাঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে রান্নার তদ্বির করতে করতে সে নিজের পড়া করে। এই অবস্থায় সেদিন মনোরমা তাঁর বিরাট বপুখানি নিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে দেখা দেন। চোখ পাকিয়ে বলেনঃ হাঁ গা নবাবের বেটী! কতক্ষণ ধরে তোমাকে ডাকছি পান সেজে দিতে। কথা কি কানে যাচ্ছেনা নাকি? লেখাপড়া হচ্ছে? বলি, লেখাপড়া করে কার সাতগোষ্ঠী উদ্ধার করবে? ওদিকে ভাত-ডাল পুড়ে একাকার, আর এখানে বিবির পড়ালেখা হচ্ছে। কতদিন তোমাকে বলেছি, এ বাড়িতে তুমি পড়ুয়া নও। তোমাকে বসিয়ে আমরা খাওয়াতে পারবোনা। যদি গতর খাটিয়ে খেতে আপত্তি থাকে, দূর হয়ে যাও এখান থেকে।

সীমা চোখের জলে মুখখানা ভাসিয়ে বলেঃ আমি ত' সব কাজই করেছি মামিমা। কখন কোন কাজটা আপনাদের করবনা বলেছি?

মনোরমা ধমক দেনঃ চুপ কর্ বজ্জাত। আবার মুখের ওপর কথা! আস্পর্ধা দিন দিন বাড়ছে, লাথিয়ে লাথিয়ে মুখ ভেঙে দেব, জানিস্।

এই সময় ভানু এসে বলেঃ অত্যাচারেরও একটা সীমা আছে মা! সীমাকে অনাথা পেয়ে তোমরা এর প্রতি যেমন অত্যাচার করছ, রাস্তার একটা কুকুর-বেড়ালকেও মানুষ ততটা করেনা।

মনোরমা রেগে বলে : তাই নাকি? তা অত্যাচারটা কোথায় হল শুনি?

ভানু বলে : আমি সব শুনেছি মা, যতই তোমাদের মন যুগিয়ে ও চলেছে, তোমরা ততই ওকে পীড়ন করছ। পাছে রান্নার অসুবিধা হয়, তাই ও দাওয়ায় বসে পড়াশুনা করে, দেখছি ত পড়তে পড়তে বার বার উঠে ভাতে ডালে কাঠি দিয়ে আসে। কোনদিন ত' ভাত ডাল পোড়েনি! তোমাদের মিছে কথার ওপর ও সত্যি কথা দুটো বলতেই, তোমার মাথা এমনি বিগ্‌ড়ে গেল, যে, মুখে লাথি মারব কথা বলতেও বাধেনি। আবার তুমি কথা বলছ মা, লজ্জা হচ্ছেনা কথা বলতে?

ক্ষিপ্তার মত তিড়বিড় করে উঠে মনোরমা বলেন : ওরে বাবারে! পেটে ধরেছি যে ছেলেকে, পরের তরে কি তার দরদ! সত্যিই এ তোর ভারি বাড়াবাড়ি হচ্ছে ভানু। তুই আমার ছেলে, এই বজ্জাতের জন্যে শেষকালে আমার সঙ্গেও ঝগড়া করবি! কেন?

ভানু বলে : কারণ আমি মানুষ। সীমা যদি কাজের ফাঁকে একটু পড়াশুনা করে তোমাদের তাতে অত গাত্রদাহ কেন বলত? তোমার মেয়ের জন্য ত' দু'দুটো মাস্টার রেখে দিয়েছিলে। তবু সে ম্যাট্রিক পাস করতে পারলো না।

মনোরমার সেই মেয়ে অর্থাৎ ভানুর বিবাহিতা বোন রমা সম্প্রতি শ্বশুরবাড়ি থেকে এখানে এসেছে। কথা কাটাকাটির সময় সে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে ভানুর সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে শুরু করে দিল। ঝগড়া চরমে উঠলে ক্ষেত্রনাথ বসবার ঘর থেকে ছুটে আসেন।

মনোরমা বলেন : ওগো, তোমার গুণধর ছেলের আস্পর্ধার কথা শোন। পরের মেয়ের তরে নিজের বোনকে কি রকম যাচ্ছেতাই করছে।

বাবাকে দেখেই ভানু নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে।

ক্ষেত্রনাথ সীমার বাষ্পাচ্ছন্ন মুখখানার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন : ছেলের দোষ কি ?

তাকে যেমন লাগায়, তেমনি সে করে। বজ্জাতের ধাড়ি। দাঁড়াও তোমার পড়ার শ্রাদ্ধ পাকাচ্ছি—বলেই মাদুর থেকে বইগুলো তুলে উঠানে ফেলতে থাকেন।

ওদিকে ভানু নেমে এসে এক এক করে বইগুলো তুলতে তুলতে বলতে থাকে : আমি টাকা দিয়ে প্রত্যেক বইখানা কিনে এনেছি, এর মর্ম তোমরা বুঝবে না।

(১৩)

হাওড়ায় অবনীর সেই সুসজ্জিত বৈঠকখানা। বন্ধুরা অবনীর প্রতীক্ষা করছিল। অবনী প্রবেশ করতেই সব চেপে ধরল। শৈলজা বলল : ফিরতে ত তোমার অত দেরী হয়না কোনদিন। কোথায় গিয়েছিলে হে ?

অবনী সুমিত্রার কথাটা বেমালুম চাপা দিয়ে বলে : কলকাতায় একটু কাজে। প্রভাস জিজ্ঞাসা করল : কাজটা হল ?

অবনী বলল : না। তবে হওয়ার আশা আছে।

নরেন বলল : তবু ভাল। এখন এস, তাসে বসা যাক।

এরই ফুরসতে একসময় বন্ধু অনিমেষ জনান্তিকে অবনীকে জিজ্ঞাসা করে : ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখতে যাসনি ত অবনী ?

অবনী মৃদুস্বরে বলল : না।

অনিমেষ আর কোন প্রশ্ন করে না।

বন্ধুদের ভিতরে থেকে প্রভাস বলে : তাহলে অবনীর বিয়েটার কি হল ?

বন্ধুরা সব এ প্রশ্নে সচকিত হয়ে ওঠে। তারাও জানতে চায়, কবে ?

অবনী তাদের হেসে বলে : বিয়ের ফুল না ফুটলে কি আর কখনো বিয়ে হয়।

বালিগঞ্জে তারকবাবুর বাড়ি। নিরুপমা সুমিত্রাকে বলেন—এখন থেকে পাড়ার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করতে হবে। যার তার সঙ্গে থিয়েটার, বায়স্কোপ কিংবা বেড়াতে যাওয়া আর চলবে না।

সুমিত্রা কঠিন মুখে জিজ্ঞাসা করে: কেন?

মা বলেন: বনেদী জমীদার অবনী বাইরে যতই ফড়ফড়ানি করুক, ভেতরটা ওদের গোঁড়া। সে হয়ত এসব পছন্দ নাও করতে পারে।

সুমিত্রা বলে: উনি দয়া করে আমাকে বিয়ে করবেন, সেই আশায় আমাকে এখন থেকে কলা-বৌ সেজে ঘরে বসে থাকতে হবে নাকি?

মা বলেন: ছিঃ, এ তুই কি বলছিস্?

সুমিত্রা উত্তর দেয়: ঠিক বলছি। আমি যা আছি, ঠিক তাই থাকবো।

ইচ্ছে হয় তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন. ইচ্ছে না হয় তিনি ফিরে যাবেন।

মেয়ের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে নিরুপমা সুধান: এটা কি তোর মনের কথা?

সুমিত্রা উত্তর দেয়: না।

তখন মা তাকে সস্নেহে আদর করে বলেন: ক'টা দিন একটু কষ্ট কর না। অবনীর মত ছেলে হাতছাড়া হলে, সারাজীবন আপসোস থেকে যাবে। বিয়েটা একবার হয়ে যাক। তারপর তোর যত খুশী বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে হল্লা করে ঘুরে বেড়াস। অবনী তোকে কিছুই বলতে পারবে না।

ব্যারাকপুর—ক্ষেত্রনাথের বাড়ি। বাইরের সেই ঘর। ক্ষেত্রনাথ তামাক সেবা করছেন। মনোরমা এসে জিজ্ঞাসা করেন : হাওড়ার সেই ছেলেটার কিছু চিঠিপত্র পেলে ?

ক্ষেত্রনাথ বলে : না। কোন সাড়াশব্দ নেই।

মনোরমা বলেন : আবাগীর বরাতে হবে কেন! তবে কি সব ভেস্তে গেল ?

ক্ষেত্রনাথ : কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। কেউ ভাংচি দিয়েছে কিনা কে জানে!

মনোরমা : মুখপোড়াদের মরণ হয়না। অতবড় জমীদারিটা এ থেকে হাতে আসবে ভাবছিলাম—গেল সব ভেস্তে।

ক্ষেত্রনাথ মৃদুস্বরে বলেন : হুঁ।

আড়চোখে স্বামীর দিকে চেয়ে মনোরমা বলেন : তোমার কি মনে হয়, তারকবাবু চিঠি লিখে ওদের সাবধান করে দেননি ত' ?

ক্ষেত্রনাথ : না, না, তারক তেমন প্রকৃতির লোক নয়।

মনোরমা : কি জানি, আমার কাউকে আর বিশ্বাস হয়না। অতবড় একটা জমীদারি হাতে পাবার জন্য অনেকেই অনেক কিছু করতে পারে। তা ছাড়া সুমিত্রা ছুঁড়িকে অবনীর পছন্দও হয়েছিল।

ক্ষেত্রনাথ : তা হয়েছিল।

মনোরমা : তুমি কি এ ব্যাপারে আর কিছু করবেনা ?

ক্ষেত্রনাথ : কি আর করা যায় বল ? জোর করে ত' আর আমি অবনীর সঙ্গে সীমার বিয়ে দিতে পারিনা।

মনোরমা : মতলবটা বেশ ভালই এঁটেছিলে কিন্তু। হয় জমিদারির ম্যানেজারী, নয় ত' হাজার টাকা খোরপোষের দাবি। সব ভেস্তে গেল।

ক্ষেত্রনাথ : বিড়ালের ভাগ্যে কি আর সব সময়ে শিকে ছেঁড়ে গিন্নি। যাকগে, তুমি ভেবোনা। অত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র আমি নই। আরো দু'চারদিন দেখি। তারপর আমি নিজেই ওকে ধরব!

মনোরমা : তাই ধর।

ক্ষেত্রনাত্র : বিদুষীর কি খবর?

মনোরমা : তাঁর এখন পাশের পড়া চলছে—ভানুবাবু কোমর বেঁধে লেগেছেন।

ক্ষেত্রনাথ : হুঁ।

(১৬)

রান্নাঘরের পাশে চোরাকুঠরির মেঝেয় মাদুর পেতে সীমা ঘুমোয়। বাড়ির সবাইকে খাইয়ে, নিজে খাওয়া-দাওয়া সেরে রান্নাঘর ধুয়ে মুছে বাসন মেজে যখন সে নিজের ঘরে প্রবেশ করে, তখম রাত বারোটা। পড়াশুনা করবার মত শক্তি তখন আর তার থাকেনা। ভানু তাকে ম্যাট্রিকের পাঠ্য বইগুলো কিনে দিয়েছে। সীমা বইগুলো গুছিয়ে রেখে, আস্তে আস্তে চোরাকুঠরির জানালায় এসে দাঁড়ায়। বাইরে দিগন্তজোড়া অন্ধকার। দূরে গীর্জার ঘড়িতে ঢং করে রাত একটা বাজে।

(১৭)

ব্যারাকপুরে ক্ষেত্রনাথের বাড়ি। তারকবাবু তাঁর স্ত্রী নিরুপমা ও তাঁর কন্যা সুমিত্রাকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। মনোরমা তাঁদের আদর যত্ন করে বসান। খানিকটা সুখ-দুঃখের মেয়েলি কথা চলে। শেষে সীমার বিয়ের কথা তুলতে, মনোরমা বলেন : হতভাগীর কপালে অত সুখ সইবে কেন? শত্রুরা সব বলে, আমরা নাকি

সীমাকে দেখতে পারিনা। ভাগ্নাকে ভাল ঘরে বিয়ে দেবার জন্য কোন্ মামা জোচ্চ রি করে আমাকে বলতে পার? ওকে ভালবাসি বলেই না।

নিরুপমা : তাত বটেই।

মনোরমা : কিন্তু ওর পোড়া কপালে অত সুখ সইবে কেন।

নিরুপমা : এ কথা বলছ কেন দিদি? কি হয়েছে? সেই দেখাশুনার পর কি পাত্রপক্ষ আর কোন চিঠিপত্তর দেননি'?

আশ্চর্য ত! সুমিত্রা সবার চেয়ে বেশী আশ্চর্য হয়। এই সময় সীমা চা নিয়ে এলে তাকে লক্ষ্য করে সুমিত্রা বলে : আমি ত' যথাসাধ্য করলাম ভাই। তোমার হয়ে প্রক্সি পর্যন্ত দিলাম। কত সব মিছে কথা বললাম।

সীমা : এর জন্য আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিতে পারবনা। কেননা, অনাবশ্যক আমাকে নিয়ে এই প্রতারণা করার কোন হেতু ছিলনা আপনার।

সুমিত্রা : প্রতারণা!

সীমা চলে যায়।

সুমিত্রা সীমার কথায় মা ও সীমার মামীকে মন্তব্য কাটে : যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।

এই উপলক্ষে মনোরমা আর একপ্রস্থ সীমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে শুরু করেন।

নিরুপমা তাকে থামান আর বলেন : আহা, যাই হোক দিদি —বাপ-মা-মরা মেয়ে।

মনোরমা : শুনলে ত সই, কথার ছিরি! যেন ওরই দায় পড়েছিল। তোমার তো মেয়ে সামনে বসে, আর—আমাদের এই আবাগী। রূপে গুণে, কথাবার্তায় চলাফেরায় [illegible] যেন ফুটে ফুটে বেরোচ্ছে।

এদিকে বাইরের ঘরে ক্ষেত্রনাথ তারকনাথকে অবনীর খোঁজখবর

জিজ্ঞাসা করেন। তারক যেন আকাশ থেকে পড়েন—তিনি জানবেন কেমন করে। তিনি ওদের ঠিকানাই জানেন না।

ক্ষেত্রনাথ: আমি বলি কি—আমাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়নি ত'?

তারক: পাগল। কে ফাঁস করবে?

ক্ষেত্রনাথ: তবে চিঠি দিলনা কেন? যাবার সময় কি বলে গেল, আর কি হল!

তারক: কি করে বলি? জমিদার মানুষ, চাল-চরিত্র আর মেজাজ-মর্জিও তো জমিদারি আদব-কায়দায়। হয়ত তোমাকে লিখতেই তিনমাস কেটে যাবে। তার চেয়ে তুমিই একখানি চিঠি লিখে ওর কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নাওনা কেন?

ক্ষেত্রনাথ: হ্যাঁ, তাই ভাবছি।

তারকবাবু, সুমিত্রা ও নিরুপমার ধাপ্পাটা এ বাড়ির কেউ, এমন কি ক্ষেত্রনাথও ধরতে পারলনা। ও পক্ষ মনের আনন্দে বাড়ি ফেরেন।

(১৮)

হাওড়া—অবনীর বাড়ি। বন্ধুরা সব পিকনিকে যাচ্ছে, অবনীকেও ওরা সঙ্গে নিয়ে যাবে। কিন্তু অবনী কিছুতেই যাবেনা।

ক্ষুব্ধ হয়ে বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করে: রবিবারের বিকেল বেলা তোমার এমন কি কাজ?

অবনী জানায়: ভীষণ জরুরী কাজ কলকাতায়। দু'দিন আগে যদি বলতে, কাজটা পেছিয়ে দিতাম।

অনিমেষ জনান্তিকে বলে: যার সঙ্গে কাজ তাকেও আমাদের সঙ্গে নিয়েই চল না হয়।

অবনী: ভুঁড়িদাস, নাগরদাস, ঝুনঝুনওয়ালাকে বল, তোমাদের সঙ্গে পিকনিকে যেতে!

বন্ধুরা : আজকাল তুমি মাড়োয়ারীদের সঙ্গে কি কাজ করছ ?

অবনী : এখনো কিছু করিনি, তবে করবো ভাবছি।

অনিমেষ কিন্তু অবনীর বানানো গল্প আদৌ বিশ্বাস করেনি। বন্ধুরা হতাশ হয়ে চলে যায়। একটু পরে অবনী গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাইরে।

(১৯)

সুমিত্রার বাড়ী—বালিগঞ্জ। সুমিত্রা সেজেগুজে তৈরি হয়ে ঘন ঘন বাইরে এসে দেখছে। অবনীর গাড়ির হর্ন শুনতে পেয়েই তাড়াতাড়ি বসবার ঘরে গিয়ে বসে রইল।

মা ছুটে এসে বললেন : অবনীবাবু তোর জন্য গাড়ি নিয়ে এসেছে। বেড়াতে যাবি না ?

গম্ভীর মুখে সুমিত্রা বলে : না, তুমিই ত' বলেছ, কলা-বৌ সেজে থাকলে আমাকে পছন্দ করবে বেশি।

নিরুপমা : তুই বড্ড বাজে বকিস।

তিনি নিজেই ছুটে যান অবনীকে অভ্যর্থনা করতে।

একটু পরেই সুমিত্রাকে নিয়ে অবনী বেড়াতে যায়। সুমিত্রার রূপ অবনীকে আকর্ষণ করে। কিন্তু তার কথাবার্তা সব সময় ভাল লাগে না অবনীর। গাড়ির মধ্যে কথায় কথায় একদিন অবনী সুমিত্রাকে বলে : তোমার লেখা পত্র আমি পেয়েছি। সুমিত্রার সলাজ সহাস্য নীরব ভঙ্গী দেখে অবনী তাকে সেই প্রেমপত্রটার কথা তুলে বলে : একজন অপরিচিত পুরুষকে কেমন করে এভাবে পত্র লিখলে তুমি ?

সুমিত্রা সহাস্যে বলে : তুমি কি আমার অপরিচিত ছিলে ? সীমাদের বাড়িতে আমাদের পরিচয় হয়নি ?

অবনী : তা বটে।

এখন সে পকেট থেকে প্রথম চিঠিটা বার করে সুমিত্রাকে দেখিয়ে বলে : এ হাতের লেখা কার তুমি বলতে পার ?

সুমিত্রা চমকে ওঠে : এ যে সীমার হাতের লেখা। সীমা তাকে আগে প্রায়ই চিঠি লিখতো। পোড়ারমুখী বুঝি অবনীকে দেখে মজেছে।

অবনী : ভয় নেই, ওটা প্রেমপত্র নয়। পড়েই দেখনা।

সুমিত্রা চিঠিখানা পড়ে। তার মুখখানি খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। অবনীর গা ঘেঁষে বসে বলতে থাকে : সব কথা খুলে না লিখে উপায় কি বল ? বিয়ের পর যদি তুমি সীমাকে রাস্তায় বার করে দাও প্রতারণার অপরাধে, সে ভয়ও ত আছে।

অবনী : চিঠি পড়ে আমার কিন্তু কেমন একটা ধারণা জন্মেছে মেয়েটা কুৎসিত হলেও সৎ।

ভ্রুভঙ্গি করে সুমিত্রা বলে : আহা-হা, সীমার জন্য যে দরদ উথলে উঠলো দেখছি। চিঠিতেই এত, ওকে দেখলে না জানি কি করে বসবে।

অবনী ; ভগবান তোমাকে অমন কাঁচা হলুদের মত রং দিয়েছেন। তার উপর কতকগুলো ছাইভস্ম মুখে মাখবার দরকার কি শুনি ?

বিরক্ত হয়ে সুমিত্রা বলে : প্রসাধন করবো না বলছ ?

অবনী : না, ঠিক তা বলছি না। তবে—থাক এ সব কথা।

সুমিত্রা : আমাকে কি তোমার ভালো লাগে না ?

অবনী : ভাল না লাগলে পেট্রোল পুড়িয়ে হাওড়া থেকে বালিগঞ্জে আসি তোমার জন্য ? তোমাকে আমার ভালই লাগে। কিন্তু—

সুমিত্রা : কিন্তু কি ? বল না কি বলতে চাও ?

অবনী : থাক, আর একদিন বলবো।

সুমিত্রা : আমি জানি তুমি কি বলতে চাও। মা আমাকে

আগেই সাবধান করেছিলেন। আমি কলা-বৌ সেজে থাকি এই তোমার ইচ্ছে। সত্যি না ?

অবনী : কি যে বল! না সুমিত্রা কলা-বৌ আমার চাইনা, আবার উগ্র আধুনিকা বৌ-ও আমার পছন্দ নয়। থাক ও সব কথা। চল, তোমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।

অবনী গাড়ি ঘুরিয়ে নিলে।

সুমিত্রা : রাগ হয়েছ ?

অবনী : না, না, রাগের কি আছে? তবে পুরুষ যাকে ভালবাসে তাকে মনের মত করে গড়ে তুলতে চায়।

সুমিত্রা : আমারো খুব সাধ যে, তোমার মনের মতন বৌ হই।

অবনী : বেশ।

(২০)

অবনীর জন্য অপেক্ষা করে করে ক্ষেত্রনাথ, হতাশ হয়ে ওঠেন। ভাবেন বোধহয় সে কনে-দেখার ব্যাপারটা ভুলেই গেছে। অত বড় রায়পুর এষ্টেটটা হাতছাড়া হওয়ার কথা ভেবে ক্ষেত্রনাথ শেষ চেষ্টা করেন, অবনীকে একখানি চিঠি লেখেন : যতদূর মনে পড়ে, মেয়ে দেখে তুমি পছন্দই করেছিলে। বলেছিলে দু'একদিনের ভেতর পাকা-দেখার তারিখ ঠিক করে জানাবে। কিন্তু আজ প্রায় তিন মাস কেটে গেল। তুমি কি এই গড়িব ক্ষেত্রনাথকে ভুলে গেলে বাবাজীবন ? আমরা কিন্তু তোমার পথ চেয়ে বসে আছি!

(২১)

হাওড়া—অবনীর বাড়ি : সেই বৈঠকখানা। ক্ষেত্রনাথের চিঠি পড়ে অবনী বন্ধু অনিমেষকে বলে : জানিস, আমার কি ইচ্ছে করছে? ইচ্ছে করছে ঐ ক্ষেত্রনাথকে আচ্ছা করে চাবকে আসি। নেহাৎই আমরা সভ্য মানুষ তাই—

অনিমেষ : সীমাকে যখন তুই বিয়েই করবি না, এ চিঠি নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি ?

অবনী : সে কথা সত্যি। সীমা কুৎসিত না হয়ে যদি অপূর্ব রূপসিও হত, তবুও আমি তাকে বিয়ে করতুম না—মামা ক্ষেত্রনাথের সঙ্গে তার রক্তের সম্বন্ধ আছে বলে।

অনিমেষ : সুমিত্রাকে তাহলে তুই বিয়ে করছিস্ ?

অবনী : সে রকম ইচ্ছে। কেন তোর আপত্তি আছে নাকি ?

অনিমেষ : না, না, আমি কেন আপত্তি করব ? বিয়ে করবি তুই।

অবনী : তোর কথার ভাবে মনে হয় এতে তোর সম্মতি নেই। কিন্তু বলবি অমত কেন ?

অনিমেষ চুপ করে থাকে। আরচোখে তার দিকে চেয়ে অবনী বলে যায় : একটা চিঠি থেকেই একটা মানুষের মনের ভিতরটা জানা যায় না। সুমিত্রার সিই চিঠিখানা পড়ে আমি তাকে যতটা খারাপ ভেবেছিলাম আসলে কিন্তু সুমিত্রা তা নয়।

অনিমেষ উদাস স্বরে বললে : তা হবে।

কি ভেবে অবনী বললে : আজ ত' অফিস ছুটো অবধি ক্ষেত্রবাবুকে নিশ্চয়ই ঐ সময় বাড়ি গিয়ে পাব। চল্ অনিমেষ, ব্যারাকপুর থেকে বেড়িয়ে আসি।

কি ভেবে অনিমেষ বলে : চল। ক্ষেত্রনাথ ও তার ভাগ্নী সীমাকে দেখে আসি।

দু'জনে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

(২২)

সেদিন আরো একটু সকাল করে অফিস থেকে ফিরে ক্ষেত্রনাথ সপরিবারে কাছাকাছি কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। ব্যারাকপুর বাড়িতে সীমা ছাড়া আর কেউ নেই।

গাড়িটা রাস্তায় রেখে, অবনীই আগে নেমে এল। দু'তিনবার ডাকাডাকি করে ক্ষেত্রবাবুর সাড়া না পেয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই অবনীর সঙ্গে সীমার চোখাচোখি হয়ে গেল। কলতলায় একরাশ বাসন নিয়ে সে মাজতে বসেছিল। আধময়লা কাদামাখা কাপড় পরণে, শ্যামবর্ণা, দিব্য স্বাস্থ্যবতী শ্রীসম্পন্না কিশোরীটিকে সে প্রথমে ক্ষেত্রবাবুর পরিচারিকা ভেবেছিল। অবনীর প্রশ্নের উত্তরে সীমাও তাই জানাল। কিন্তু পরিচারিকার নম্র মুখভঙ্গী ও কথার ভাষা তাকে একটু চমকে দিল বৈকি। সীমার কথায় ক্ষেত্রবাবুরা রাত ন'টার আগে ফিরবেন না জেনে অবনী ফিরে যাচ্ছিল। গাড়িতে ওঠবার সময় হঠাৎ ভানুর সঙ্গে দেখা। সাইকেল চড়ে ভানু বাড়ি ফিরছিল। অবনীর সঙ্গে ভানুর পুরনো পরিচয়, কলেজের সহপাঠী। ভানুকে দেখে অবনী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে: এখানে? ভানু জানায় এই তার বাড়ি।

অবনী জানতে পারে ক্ষেত্রবাবু তার বাবা। বললে: তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। অনেক ডাকাডাকির পর দরজা ঠেলতেই একটা ঝিকে দেখলাম—

ভানু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল: ঝি?

অবনি বলল: হ্যাঁ, বেচারা বাসন মাজছিল কলতলায় বসে।

ভানু বলল: সে ত ঝি নয়, আমার পিসতুতো বোন সীমা।

অবনী: সীমা? আমরা কি তাহলে—

ভানু: এখন মনে পড়েছে, শুনেছিলাম হাওড়া থেকে মস্ত এক জমিদার তাকে দেখতে এসেছিলেন। আমি সেদিন বাড়ি ছিলাম না। কিন্তু দেখা মেয়েকে চিনতে পারলে না—বাসন মাজছিল বলে?

অবনী: তাও ত' বটে। আমিও ত' ভাবছি এত তাড়াতাড়ি কি করে সেদিনের দেখা সীমার চেহারা এভাবে বদলে গেল।

ভানু কথাটি নিজে মনে মনে বলল: সত্যি! ওর চেহারাটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবে বলে রাত জেগে

পড়া, তার ওপর সংসারের রাজ্যের কাজ, তুমি ওকে ঝি ঠাওরেছিলে বলে কটাক্ষ করছি। কিন্তু আসলে ঝি ও পাচিকার ত্ব' দফা কাজই ও বেচারীকে করতে হয়। যাক—বিয়ের কি হল?

অবনী হাতঘড়ি দেখে বললেঃ আসছে হপ্তায় একদিন আসব। সেদিন ভাল করে ও বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। আজ আসি।

অবনী চলে যায়।

বাড়ি এসে ভানু সীমাকে বলেঃ কেন তুমি নিজেকে এ বাড়ির ঝি বলে পরিচয় দিলে?

কথায় কথায় সীমা তখন ভানুকে সেদিনের কনে দেখার সমস্ত ইতিহাস খুলে বললে। শুনে চমকে উঠলো ভানু, বললঃ বাবা এ কাজ কেমন করে করলেন। আর তুমিই বা এতদিন সে কথা চেপে রেখেছিলে কেন? অবনীর কাছে গিয়ে বাবার হয়ে একদিন আমাকে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে দেখছি।

(২৩)

বালিগঞ্জে সুমিত্রার বাড়িতে আজ তার জন্মদিনের পার্টি। যে সব বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীস্বজন এসেছে অবনীর স্থান সবার উপর। সুমিত্রার মা মনে আশা করছেন আজই বুঝি অবনী সুমিত্রার পাণি-প্রার্থনা করবে, অর্থাৎ বাগ্‌দান। সুমিত্রা মাকে বলেঃ বিয়ে ত' হবেই। তাড়াহুড়ো করে অবনীবাবুর মন খিঁচিয়ে দিয়োনা না মা

হাসি, গল্প। খাওয়া-দাওয়া। অবনী সুত্রিাকে আংটি না দিয়ে, একজোড়া হীরের ত্বল উপহার দিলে। আংটি দিয়েই সাধারণতঃ বাগ্‌দান করা হয়। এমন দামী উপহার দেখেও সুমিত্রার মার মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। কারণ সুমিত্রার বন্ধুদের চাপল্য অবনীর ভাল লাগে না। বিশেষ করে ওদের সঙ্গে সুমিত্রার অন্তরঙ্গতা বেশি, ওদের কথাবার্তাও রুচি-বিগর্হিত। সুমিত্রা কেমন করে ওদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করে অবনী তা বুঝতে পারে না। তথাপি অবনী সুমিত্রার

মাকে ও তারকবাবুকে অভয় দিল। সব ঠিক আছে। তারকবাবু লোকটা আসলে মন্দ নন। যা কিছু ধাপ্পাবাজী তিনি করেন, অভাব-অনটনে পড়ে। ইদানীং স্ত্রী-কন্যার সাজসজ্জা ও বাহ্যিক আড়ম্বরের ধাক্কায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। কথায় কথায় তারকবাবু ভাবী জামাতার নিকট ক্ষেত্রনাথ ও সীমার সম্পর্কে দু-একটা বেফাঁস কথা বলে বসেন। সীমার পিতৃকুলের কথা উঠলে তারকবাবু বলেন ঃ আমি এইটুকু জানি, সীমার বাবা মুঙ্গেরে মস্তবড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ক্ষেত্রনাথের তখন খুব দুরবস্থা—দিন চলে না। ভগ্নীপোতের কাছ থেকে কিছু টাকা বাগাবার জন্যে ও মুঙ্গেরে যায়। তখন সেখানে প্লেগের মরশুম শুরু হয়েছে, ক্ষেত্র সেখানে যাবার পরেই সীমার বাপ-মা দু'জনেই প্লেগে আক্রান্ত হলেন, সিরিয়াস টাইপের রোগ, একদিনেই ক'ঘণ্টার আড়াআড়ি দু'জনেই মারা পড়েন। শহর ছেড়ে তখন লোক পালাচ্ছে, কে কার খবর রাখে। ক্ষেত্র কিন্তু পালিয়ে এল না, বরং চেপে বসল। মাস দুই পরে বছর চারেকের ভাগ্নী সীমাকে নিয়ে যখন কালিঘাটের ভাড়াবাড়িতে ফিরে এল, চেহারাও বেশ ফিরে গেছে, আর মেজাজও বদলেছে। তবে আমাদের মত পাড়া প্রতিবেশিদের কাছে রটনা করলেন—ভগ্নীপোতের একরাশ দেনার সঙ্গে মেয়েটাও ঘাড়ে পড়েছে। দেনা শুধতে হয়ে আর এটা পুষতে হবে। এর পরেই ক্ষেত্রনাথ ব্যারাকপুরে বাড়ি কিনে উঠে যায়, কনট্রাকটারী কারবার ফাঁদে, অবস্থা বদলে যায়। এ থেকে লোকের মনে নানা কথা ওঠে, বলে—ভগ্নীপোতের টাকাতে বরাত ফিরিয়ে নিয়েছে।

অবনী জিজ্ঞাসা করে ঃ আপনার কি মনে হয়? তারকবাবু বলেন ঃ মুঙ্গেরে যাবার আগে ওর অবস্থা ভাল ছিলনা, টাকার অভাবে ওর'দড়ির' কারবার দেনায় ডুবে গিয়েছিল, এসব তো আমার জানা কথা। কতদিন বলেছে, ঐ দড়ি গলায় বেঁধে ঝুলে পড়তে হবে। এমনি সময় খেয়াল হলো মুঙ্গের গিয়ে বড়লোক ভগ্নাপোতকে ধরলে হয়না। এসব

আমার জানা কথা। সেখানে গেল, ফিরেও এল, অবস্থা ফিরে গেল। এ থেকে বুঝে নাও বাবাজী, আমার কি মনে হয়। তবে দুঃখ এই, মেয়েটার ওপর ওরা অমানুষিক অত্যাচার করে, সীমা কিন্তু বড় ভাল মেয়ে। গায়ের রংটা কালো হলেও তাতে এমন একটা জেল্লা আছে, চোখ জুড়িয়ে যায়। দেহের শ্রীছাঁদ মুখ-চোখ সবই চমৎকার। আর কি নম্র তার স্বভাব। যাই হোক, তুমি বাবাজী ওর জন্য একটা ছেলে খুঁজে দিও। গরীব হয় ক্ষতি নেই, কিন্তু যেন সৎ হয়।

তারকবাবুর বর্ণনা শুনতে শুনতে সীমার সেই ম্লান মূর্তিখানি অবনীর মানস মধ্যে ভেসে ওঠে। সে উঠে দাঁড়ায়।

তারকবাবু বলেন : এ কি ? এখনি উঠলে যে !

সুমিত্রা তার পথ আটকে দাঁড়ায়। বলে : না-না, এত শিগগীর তোমার কিছুতেই যাওয়া হবেনা।

অবনী বলে : বড্ড মাথা ধরেছে।

নিরুপমা ছুটে এসে বলেন : কিন্তু সুমিত্রার জন্মদিন, তুমি মিষ্টিমুখ না করেই চলে যাবে ?

অবনী : এ বাড়িতে আমার মিষ্টিমুখ করা ত' নূতন কথা নয়। কিন্তু আজ আমি আর কিছুতেই বসতে পারছিনা, মাপ করবেন।

অবনী চলে যায়, নিরুপমা তারকবাবুকে চেপে ধরেন। বলেন : তোমার জন্যই একাণ্ড হলো, কেন বলতে গেলে ওকে সীমার কথা ...মুঙ্গেরের কথা....ওর বাপের নামডাকের কথা ! তোমার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি দিন দিন লোপ পাচ্ছে ?

(১৪)

ব্যারাকপুরে ক্ষেত্রনাথবাবুর বাড়ি। রাতের রান্নাবান্না শেষ করে সীমা নিজের চোরাকুঠরিতে এসে একটু বিশ্রাম করছে।

ক্ষেত্রনাথবাবু ও ভানু তখনো বাড়ি আসেনি, এলে খেতে দেবে।

ঘড়িতে দশটা বাজলো, আজ শরীরটা ওর ভাল নেই, তক্তপোষখানির উপর সবে মাত্র বসেছে, এমন সময় বিবাহিত রমা বললে : মা তোমাকে কখন থেকে ডাকছেন আর তুমি বেশ আরাম করে শুয়ে আছ ?

পরক্ষণেই সীমা মনোরমার কক্ষে প্রবেশ করতেই তার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে তিনি বললেন : শোবার ঘরের আলমারিটা পরিষ্কার করবার জন্যে আজ ক'দিন ধরেই বলা হচ্ছে, কিন্তু তোমার তাতে হুঁশই নেই। ওর ভেতর যত সব আরসোলা, ইঁদুরের বাসা হয়েছে। তা হবেনা ? যত রাজ্যের বাজে কাগজ খাতা আর খালি টিনের কৌটায় ভর্তি। বলে বলে মুখটা তো ভোঁতা হয়ে গেল—

সীমা : ক'দিন ধরে শরীরটা ভাল নেই। তাই হয়ে ওঠেনি।

মনোরমা : সোমত্ত মেয়ে। দু'বেলা কাঁড়ি কাঁড়ি গিলতে তো হেলা নেই। কেন ! শরীরে তোমার কি হয়েছে শুনি ?

সীমা : এখনি সব পরিষ্কার করছি ! ওঁরা ফিরলে রমাদি তুমি খেতে দিও। রান্নাঘরে সব আমি গুছিয়ে রেখে এসেছি।

মনোরমা ঝংকার দিয়ে বললেন : থাক্ থাক্, আর ঢস্ দেখিয়ে কাজ নেই। রমাদি তোমার বাঁদি কিনা—দু'দিনের জন্যে বাপের বাড়ি এসে তোমার হুকুমে হেঁসেল নিয়ে বসবে। এই বলে রাখছি, কাল খাওয়া-দাওয়ার পাট সেরেই ঐ আলমারি নিয়ে পড়বে।

সীমা : তাই হবে মামীমা।

মনোরমা : বেশ এই কথাই রইল। এখন আমার মাথাটা একটু টিপে দাও দেখি।

(২৫)

হাওড়ায় অবনীর বাড়ি। অবনী নিজের শোবার ঘরে আস্তে আস্তে পায়চারি করছিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়। অনিমেষ প্রবেশ করে। পিসিমা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে

পড়েছেন অবনীর বিয়ের তারিখ স্থির করবার জন্য। অবনী মত দিলেই, পিসিমা ও অনিমেষ তারকবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সব ঠিকঠাক করে। অবনী কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারেনা। ক'মাস সুমিত্রার সঙ্গে সে মেলামেশা করেছে। সেদিক থেকে সুমিত্রাকে বিয়ে করাটা ওর মরাল অবলিগেসন, কিন্তু মনে জোর পাচ্ছে কোথায়? সুমিত্রা কি সত্যি অবনীকে ভালবাসে? কিন্তু তার এই ভালবাসার মূলে বড় কোন্‌টি—অবনী, না তার টাকা? বুঝতে পারেনা অবনী। অনিমেষ কিন্তু সুমিত্রারই পক্ষ গ্রহণ করলেও মরাল অবলিগেসনের কথা বলে খোঁচা দেয়। যদি সুমিত্রাকে বিয়ে না করে, বড় আঘাত পাবে সে। অবনী বলে, তা হয়ত পাবে। শেষে সাব্যস্ত হয়, সুমিত্রাকে সে বিয়ে করবে। এখন পিসিমা ও অনিমেষ একদিন তারকবাবুর বাড়ি গিয়ে সব স্থির করুন।

(২৬)

ব্যারাকপুরে ক্ষেত্রনাথের বাড়ি। মনোরমা মারমুখো হয়ে উঠেছেন, সীমার ওপরে, এখনও সেই আলমারিটা পরিষ্কার করা হয়নি। ভেবেছে কি হতচ্ছাড়ি?

সীমার শরীটা সত্যই ভাল নেই। তাছাড়া সময়ই বা কোথায় তার? রান্নাবান্না করে, সবাইকে খাইয়ে নিজে খেয়ে উঠে বাসন মাজতে মাজতে বেলা তিনটে হয়ে যায়। এরপর আবার ঘড়ির কাঁটার কাঁটায় ঠিক চারটের সময়, মনোরমা ও রমাকে চা দিতে হয় তাই সে নিজের ভাত-ব্যঞ্জন চাপা দিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বাসনগুলি মাজতে বসেছে। এদিকে খাওয়া-দাওয়ার পর রমাকে নিয়ে মনোরমা পাড়া বেড়াতে যাবার সময়, উঁকি দিয়ে দেখেন, সীমা কলতলায় বাসন নিয়ে বসেছে। মনোরমা চটে যান, বলেন: কাঁড়ি গিলেই আগে আলমারি সাফ করবার কথা ছিলনা?

সীমা : বাসনগুলো পড়ে থাকলে সকড়ি শুকিয়ে যায়, বিকেলে মাজতে কষ্ট হয়, তাই—

মনোরমা : কষ্ট হয়—ননীর অঙ্গ তোমার গলে যাবে, বলতে লজ্জা হয়না ? আমি কি বুঝিনা—নবাব-নন্দিনীর আসলে মতলবখানা কি ? আলমারি সাফ করা যাতে চাপা পড়ে যায়।

তাড়াতাড়ি বাসনগুলির ওপর জল ঢেলে দিয়ে সীমা বলে : আমারই তবে ভুল হয়েছিল মামীমা, বেশ—আলমারি সাফ করে তার পরই বাসন মাজবো। তবে কাঁড়ি গেলার কথা যা বললেন, রান্না ঘরে ঢাকা দেওয়া আছে। আপনার আলমারি সাফ না করে মাথায় জল দেবনা, আর কাঁড়িও গিলবোনা। বলেই রমার ঘরের মধ্যে যায়।

রমা : তা বলে চায়ের কথা যেন মনে থাকে-- বেড়িয়ে এসেই যেন চা পাই।

সীমা : পাবে রমাদি, সে হুঁশ আমার আছে।

মনোরমা : রাগের মাথায় আলমারির কাগজপত্রগুলো রাস্তায় ফেলে দিওনা যেন—ফিরিওয়ালাদের বেচলে কিছু পাওয়া যাবে।

কাজ করতে করতে সীমা বলে : কিছু ফেলবোনা মামীমা, বস্তায় ভরে রাখবো।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেই সীমা আলমারিটা পরিষ্কার করতে শুরু করে। পুরনো কাগজ-বই-খাতা ইত্যাদিতে ভাত সেল্‌ফ্‌গুলো। একটা বাণ্ডিল খুলতে, 'মুঙ্গের এমপোরিয়াম' ছাপা নামটি তার চোখে পড়ে, তার বাবার কারবারের এই নাম ছিল। সেই বাণ্ডিলের কাগজগুলি ঘাঁটতে ঘাঁটতে পুরানো দিনের কথা সীমার মনে পড়ে অস্পষ্টভাবে, সে আনমনা হয়ে ওঠে।

(২৭)

মুঙ্গেরের একটি দৃশ্য। সীমার বাবা উপেন্দ্রনাথের বসবার ঘর। সুদৃশ্য আসবাবপত্রে সজ্জিত। ছোট সীমা পিয়ানো বাজিয়ে গাইছে। বাবা ঘরে ঢুকে কন্যার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরেন। সীমার মা রান্নাঘর থেকে ছুটে আসেন, সে দৃশ্য উপভোগ করতে। অবস্থাপন্ন সুখী পরিবার। গান শেষ হলে, বাবা-মা-মেয়েতে বসে নানা গল্প হয়। সীমার বয়স তখন ৪.৫ বছর। সে বয়সে গান গায়, নাচে। মেয়ে স্কুলে পড়ে। নিজের কথা, বাপ-মার-কথা, ঘর বাড়ির কথা আবছা আবছা মনে পড়ে……সেই সময় তার মামা ক্ষেত্রবাবু সে বাড়িতে আসেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ও চেহারায় দারিদ্র্যের ছাপ। তার বাবা উপেনবাবুর সামনে অতি দীনহীন ভাবে মামা ক্ষেত্রনাথ কথা বলেন। তার বাবা মামাকে নিয়ে অফিস-ঘরে চলে যান।……মামাকে সীমা সেই প্রথম দেখে। সীমা নিশ্বাসমোচন করে আবর কাগজগুলো গুছোতে শুরু করে।

ভানু বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে বলে : কিরে, তুই খাবিনা নাকি?

সীমা বলে : এখানকার কাজগুলো সেরে তবে খাবো দাদা।

ভানু বলে : আমি এখুনি এসে তোর কাজ করে দিচ্ছি। তুই খেয়ে নে আগে।

ভানু নিজের ঘরের দিকে চলে যায়, সীমার মনে আর একদিনের স্মৃতি ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে।

(২৮)

মুঙ্গের। উপেনবাবুর সাজানো বৈঠকখানা। বাইরে ঝড়বৃষ্টি। আকাশে বাজ ডাকছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। প্রায়ান্ধকার ঘরে

মেঝের উপর ছোট সীমা আলুথালু বেশে পড়ে আছে। দরজা খুলে মামা ক্ষেত্রনাথ ভিতরে প্রবেশ করেন। সীমা তাঁকে দেখে ডুকরে কেঁদে ওঠেঃ আমার বাবা-মা একসঙ্গে চলে গেল আমাকে একলা ফেলে। আমি কি করে এখানে থাকবো? বাবা গো, মা গো—

মামা প্রবোধ দিয়ে বলেন: কেঁদে মন খারাপ করোনা মা। তোমার মা সতী লক্ষী ছিলেন, তাই স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে তিনিও মৃত্যুকে বরণ করে সবাইকে অবাক করে দিলেন। ভাবছি এই দেখবার জন্য কি আমি এখানে এসেছিলাম। এরপর একখানি চেয়ারে বসে বিড়ি ধরিয়ে সীমাকে জানান যে, দেনায় উপেনবাবু যে আকণ্ঠ নিমজ্জমান ছিলেন তিনি তা ভাবেন নি। দেনা মেটাতে ব্যবসা, বাড়ি, নগদ টাকা ও ঘরে সোনা-দানা যা ছিল, সব গেল। সীমা এখন বলতে গেলে পথের ভিখারী। তবে ক্ষেত্রনাথ তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে নিজের মেয়ের মত করে মানুষ করবেন। হ্যাঁ, ভোরের গাড়িতেই সীমাকে নিয়ে তিনি কলকাতা যাত্রা করবেন।

সীমার চেতনা ফিরে আসতেই তার দু'চোখের কোণ বেয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরে। কোথায় গেল সে সব দিন। সে কি স্বপ্নেও ভেবেছিল এ অবস্থা হবে তার। বাপ-মার আদরের দুলালী আজ মামার সংসারে কৃতদাসী। ভানু এসে সীমাকে কাঁদতে দেখে বলে: আমি বুঝেছি, তোর খুব ক্ষিদে পেয়েছে। কাগজগুলো আমি গুছিয়ে রাখছি, তুই খেতে যা। সীমা কিন্তু কিছুতেই যাবে না। অগত্যা ভানু ও সীমা দু'জনে মিলে আলমারি পরিষ্কার করে তখন। বাজে কাগজের সঙ্গে সহসা একখানি পুরানো নোট বই তাদের দৃষ্টিতে পড়ে। ঐ নোটবই-এ ক্ষেত্রনাথের নিজের হাতে লেখা একটা নোটবই হিসাবের ফর্দ পড়ে তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যায়। ক্ষেত্রনাথ মুঙ্গের থেকে উপেনবাবুর বাড়ি ও ব্যবসায় বিক্রি করে প্রায় দু'লাখ টাকা, নগদ একলাখ টাকা ও জুয়েলারী বিক্রী করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার

টাকা—মোট সাড়ে তিন লাখ টাকা পান। ঐ টাকা থেকে লাখ টাকা খরচ করে তিনি ব্যারাকপুরে বাড়ি করেন। বাকী টাকা ব্যবসায় খাটাচ্ছেন। ভানু নোটবইখানা পকেটে রাখলো। এতদিনে ভগবান তার হাতে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েছেন। সীমার জন্য কিছু করতে পারে কিনা এবার সে দেখবে।

সীমা ঃ ও খাতাখানা রেখে তুমি কি করবে দাদা? বরং ওটা নষ্ট করে ফেল।

ভানুঃ ছিঃ, তোর মুখে ও কথা শোভা পায় না। জানিস, এ খাতা থেকেই প্রমাণ করব আমি, তুই হা-ঘরে অনাথা নস্। তুই এ বাড়ির ভেতুড়ে মেয়ে নস্—তোরই টাকায় এরা আজ রাজার হালে দিন কাটাচ্ছে, বড় ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, আর তোকে রেখেছে বাঁদি করে। এত বড় অন্যায় কি ভগবান সহ্য করেন রে! এখন তুই জেনে রাখ—এই ঘর বাড়ি আমাদের যা কিছু, সবেরই মালিক তুই।

সীমা উল্লসিত কণ্ঠে বলে ঃ দাদা কি বলছ?

ভানু ঃ সত্য বলছি, তোকে এখন শক্ত হতে হবে। এ বাড়ির ক্রীতদাসীর কাজ তুই আর করবি না। বাবাকে তুই বাধ্য করবি, হোস্টেলে রেখে তিনি যাতে তোর পড়াশুনার খরচা বহন করেন।

সীমা ঃ এ নিয়ে আমি কিন্তু কথা কাটাকাটি করতে পারব না দাদা।

ভানু ঃ নিজের দাবি পেশ না করলে এ জীবন থেকে তোর মুক্তি নেই। ভয় কি? আমি তোর পেছনে। আর আমাদের দু'জনের হাতে রয়েছে এই ব্রহ্মাস্ত্র।

(২৯)

সেদিন সন্ধ্যায় বসবার ঘরে ক্ষেত্রনাথ যখন অভ্যাসমত হিসাবের খাতা পরীক্ষা করছিলেন, সীমা তার সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর একটু শক্ত হয়ে জানাল ঃ আসছে জানুয়ারি থেকে সে কলকাতার

হোস্টেলে থেকে স্কুলে পরবে। মামা যেন সে বন্দোবস্ত করে দেন
সীমাকে এ সুরে কথা বলতে দেখে ক্ষেত্রনাথ একেবারে বিমূঢ়।
প্রথমে সীমাকে যা-তা বলে অপমান করেন। মনোরমা শোবার ঘর
থেকে ছুটে আসেন। তিনিও স্বামীর সঙ্গে যোগ দিয়ে সীমাকে
খুব একচোট গালাগাল করেন। কিন্তু সীমার যেন আজ কি হয়েছে।
সে কিছুতেই দমবে না। মনোরমা ও ক্ষেত্রনাথের মুখে মুখে কথা
কইছে। মনোরমা তখন রেগে বলেন: বাড়ি থেকে ঝেঁটিয়ে দূর
করে দিলে তখন ঠিক হবে।

সীমা শক্ত হয়ে বলে: নগদ তিনলাখ টাকা ও গয়াপত্রগুলো
এখন যখন হজম হয়ে গেছে, বাড়ি ছেকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে আর
অসুবিধা কি?

ক্ষেত্রনাথ ও মনোরমা পরস্পরের দিকে তাকান। এসব কথার
মানে! ক্ষেত্রনাথ সীমাকে প্রশ্ন করেন। আর কথা-কাটাকাটির পর
স্বামী-স্ত্রী দু'জনে সীমাকে মারতে যায়।

ভানু ছুটে আসে: সাবধান! সীমার গায়ে হাত তুললে, আমি
তোমাদের কোর্টে দাঁড় করাব। বাবা-মা বলে এতটুকু খাতির
করবনা। লজ্জা করেনা, যার টাকায় আজ বড়মানুষ হয়েছ, তাকে
একটা কৃতদাসী করে রাখতে—

ক্ষেত্রনাথ ভানুকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। ভানু
সেই নোটবইখানা নিয়ে হোস্টেলে চলে যায়। সীমা রান্নাঘরে
গেলে স্বমৌ-স্ত্রীতে কথা হয়: ব্যাপার কি? মুঙ্গের থেকে উপেন-
বাবুর কোন বন্ধু-বান্ধব এখানে এসেছেন নাকি! কিন্তু তেমন কেউ
আছেন বলে ত' জানিনা।

মনোরমা: আসুকগে! আমরা সীমার বাবার টাকা হজম করেছি
তার কি প্রমাণ আছে? এ নিয়ে কোন কথা উঠলে তুমি মিথ্যে বলে
উড়িয়ে দেবে, যে তুলবে এসব কথা, তার নামে মকদ্দমা করবে।

ক্ষেত্রনাথ: করবই ত', তাকে উচিৎ মত শিক্ষা দেব।

হাওড়ায় অবনীর বাড়ি গিয়ে ভানু তার সঙ্গে দেখা করে অবনী তাকে আদর করে বসায়। ভানু বলে, ক্ষেত্রনাথ তার সঙ্গে যে জোচ্চুরি করেছেন, তারপর অবনীর সঙ্গে সীমার বিয়ের কথাই আর ওঠেনা। সে বিয়ের কথা বলতে সে আসেনি। অবনী মহানুভব, উদার। বিপন্নকে সাহায্য করার ক্ষমতা ওর আছে। অনেক আশা নিয়ে আজ সে তার কাছে এসেছে যে ক্ষেত্রনাথের হাত থেকে সে সীমার সম্পত্তি উদ্ধার করবে।

সবিস্ময়ে অবনী বলে : সীমার সম্পত্তি !

ভানু তখন সেই নোটবইখানা অবনীর হাতে দিয়ে বলে : সীমার বাবা মারা গেলে উনি সীমার অভিভাবকরূপে কত টাকা পেয়েছেন—এতে সেই হিসাব লেখা আছে। বুঝতে পারছ—সে অভিভাবক আমার বাবা। বাবার নিজের হাতের লেখা। তুমি যদি একটু চেষ্টা কর, সীমা তার পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে পারবে !

অবনী বলে : কিন্তু তাতে ত' তোমারই ক্ষতি। তুমি ক্ষেত্রবাবুর একমাত্র ছেলে—তাঁর বিষয়ের উত্তরাধিকারী।

ভানু বলে : সে ক্ষতি আমার সইবে। কিন্তু—সীমার বাবার সর্বস্ব গ্রাস করে তাকে নিঃস্ব, আশ্রিত বলে যে ক্ষতি করা হচ্ছে, আমি তা সহ্য করতে পারবোনা। তাছাড়া অন্যের সর্বস্ব লুঠ করা টাকার ওপর আমার কোন লোভ নেই।

অবনী বলে : তুমি নিজে তোমার বাবার সঙ্গে বোঝাপড়া কর না কেন ! আমি বাইরের লোক, আমাকে এ বিষয়ে জড়ানো ঠিক নয়। তা ছাড়া সুমিত্রার সঙ্গে আমার বিয়ের কথাও পাকা হয়ে গেছে।

ভানু : তাহলে এখন চলি।

অবনী : চা খেয়ে যাও।

ভানু : না, তোমার এখানে চা খাওয়ার প্রবৃত্তি আমার নেই। তুমি এত স্বার্থপর, আমার ধারণা ছিল না।

ভানু চলে যায়।

অবনী চিন্তিত মুখে জানালায় এসে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ বাদে টেবিল থেকে কলমটা তুলতে গিয়ে দেখে সেই নোটবইখানা পড়ে আছে। সে নোটবইখানা খুলে পড়ে। হ্যাঁ, হিসাবটা যেমন পরিষ্কার-ভাবে লেখা রয়েছে, এরপর আর সন্দেহের কোন কারণ নেই যে, ক্ষেত্রনাথ সীমার টাকায় আজ বড়মানুষ।

সহসা সেই দৃশ্যটা অবনীর মনে পড়ে। যখন কলতলায় দাঁড়িয়ে কিশোরী মেয়েটি বলছিল, সে এ বাড়ির ঝি। সীমার লেখা প্রথম চিঠিখানি হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে বার করে আর একবার সে পড়ে।

পরক্ষণে সে প্যাডখানা সামনে টেনে ক্ষেত্রনাথকে চিঠি লিখতে বসে। আসছে রবিবার ক'জন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সে সীমাকে দেখতে যাবে। ক্ষেত্রবাবু যেন বাড়ি থাকেন।

অনিমেষ আসে। পিছন থেকে লেখা চিঠিখানা দেখে বলে : আবার ক্ষেত্রনাথকে চিঠি কেন?

অবনী : সুমিত্রাকে আমি বিয়ে করব। কিন্তু তার আগে ক্ষেত্রনাথকে সায়েস্তা করবার জন্য রবিবারে তোমাদের সবাইকে সঙ্গে করে আর একবার ব্যারাকপুরে যাব।

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করে : এ যাওয়ার পেছন কি সীমাকে পাওয়ার কোন উদ্দেশ্য—

অবনী : না না, সীমাকে বিয়ে করবার জন্য নয়।

(৩১)

চিঠি পেয়ে ক্ষেত্রনাথ খুশীও হন, ভাবিতও হন। মনোরমার সঙ্গে পরামর্শ করতে বসেন। পাকা-দেখার খবরটাই না পাঠিয়ে

অবনী কেন আবার সীমাকে দেখতে চায়। তবে কি সে সন্দেহ করেছে ? না কি সে শুধু খেয়াল। জমীদার মানুষ, একটু খেয়ালী হওয়াই ত সম্ভব।

মনোরমা : সুমিত্রাকে ওদিনও নিয়ে এসে অবনীকে দেখিয়ে দাও। তখন যারা তোমার নামে অপবাদ দিয়েছিল তাদের মুখে চুনকালি পড়বে।

ক্ষেত্রনাথ : যদি সুমিত্রাকে আসতে না দেয়। কানাঘুষায় শুনেছি কোন্ এক বড়লোকের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে তারক। তার কথার সুরও কেমন কেমন।

মনোরমা : একশখানেক নগদ তাঁর হাতে গুঁজে দাও দেখি, হাসিমুখে মেয়েকে নিয়ে হাজির হবে। তবে তুমিও উল্টো গাইবে, বলবে এবার রায়পুরের খেয়ালী বাবু নয়—উদয়পুরেয় রাজাবাবু আসছেন দেখতে।

ক্ষেত্রনাথ : তারপর ? বৈঠকখানায় গিয়ে যখন সুমিত্রা দেখবে সশরীরে ও সবান্ধবে খোদ অবনী বসে ? তখন—

মনোরমা : বললেই হবে, তখন শুনেছিলুম ; এখন দেখছি রাজারাজড়াদের এ একটা চাল।

(৩২)

ক্ষেত্রনাথ তারকের শরণাপন্ন হন। মনোরমার পরামর্শ মত অবনীর নামটা গোপন রেখে তিনি বলেন : আর একটা বড়লোকের ছেলে সীমাকে দেখতে আসছে রবিবার বিকেলে, সুমিত্রাকে এদিনও ভায়া পাঠাতে হবে।

তারকবাবু প্রথমে রাজী হন না। গৃহিণীর আপত্তি জানিয়ে কথাটা প্রত্যাখান করেন। তখন তিনি গৃহিণী নিরুপমার শরণাপন্ন হন। এক হাজার টাকা তিনি এর জন্য তাকে দিতে প্রস্তুত। দুইশত

আগাম দিলেন। এপক্ষেরও তখন টাকার খুব টানাটানি। অগত্যা নিরুপমা ও সুমিত্রা তখুনি রাজী হয়ে যায়।

(৩৩)

বন্ধুদের নিয়ে অবনী সীমাকে দ্বিতীয়বার দেখতে এসেছে। ক্ষেত্রবাবু তাদের আদর যত্ন করে বসান।

অবনী বিনয় করে বলে : তিনমাস আগে দেখেছিলাম, আপনার ভাগ্নীর মুখখানি আমরা ভুলেই গেছি। তাই আর একবারটি তাকে দেখতে চাই, যদি অসুবিধা না হয়।

ক্ষেত্রনাথ : না-না, অসুবিধা আর কি।

সুমিত্রাকে সেদিনের মত পাত্রী সাজিয়ে বসবার ঘরে নিয়ে আসেন ক্ষেত্রনাথ। অবনী ও সুমিত্রা দু'জনেই চমকে ওঠে।

অবনী : ইনিই কি আপনার ভাগ্নী ?

ক্ষেত্রনাথ বলেন : কেন, চিনতে পারছনা বাবাজী, সেবার ত' একেই দেখেছিলে।

সুরেশ ও অনিমেষ তখন সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করে : আপনার নাম কি ?

সুমিত্রা চুপ করে থাকে।

অনিমেষ দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করে : নকল কনে সেজে বর ঠকিয়ে বেড়ানোই বুঝি আপনার পেশা ?

সুমিত্রা কট্‌মট্ করে ক্ষেত্রনাথের দিকে তাকায়। ক্ষেত্রনাথ বিবর্ণ হয়ে ওঠেন।

সুমিত্রা : হ্যাঁ, আমি কনে সেজে বর ঠকিয়ে বেড়াই, আর আপনার বন্ধুর কাজে হচ্ছে বর সেজে কনে ঠকানো।

অবনী ক্ষেত্রনাথের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে : ক্ষেত্রবাবু, আমরা আপনার পরিহাসের পাত্র নই। আপনার ভাগ্নীর পরিবর্তে

তারকবাবুর মেয়েকে কনে সাজিয়ে আমাদের সামনে হাজির করার অর্থ কি ?

আমতা আমতা করে ক্ষেত্রনাথ বলেন ঃ দেখুন……মানে……

এই সময় সুমিত্রা বলে ঃ তা হলে এই তোমার মনে ছিল ? ভাগ্যিস্ আমি এসেছিলাম, তা না হলে, এসব কথা চাপা থাকত, কিছুই জানতামনা।

অবনী বলে ঃ সুমিত্রা দেবী, বর সেজে কনে ঠকিয়ে বেড়ানো আমার পেশা নয়। কেন এখানে এসেছি, একটু অপেক্ষা করলে বুঝতে পারবেন। কিন্তু তার আর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না আর।

সুমিত্রা প্রশ্ন করে ঃ তার মানে ?

এদের কথাবার্তা ঠিক বুঝতে না পেরে ক্ষেত্রনাথ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকান। ক্ষেত্রনাথকে অবনী বলতে থাকে ঃ আমরা আপনার ভাগ্নী সীমা দেবীকে দেখতে এসেছি ক্ষেত্রবাবু। সুমিত্রা দেবীর উপস্থিতির কোন প্রয়োজন এখানে নেই। আপনি দয়া করে সীমা দেবীকে একবারটি নিয়ে আসবেন কি ?

ক্ষেত্রনাথ বললেন ঃ না, তাকে এনে কোন ফল নেই। আপনার পছন্দ হবেনা।

অনিমেষ বলে ঃ তার মানে সীমা দেবীকে আপনি আমাদের কিছুতেই দেখাতে চাননা ?

ক্ষেত্রনাথ ততক্ষণ নিজেকে সামলে নিয়ে গল্প কেঁদে বলেন ঃ আসল কথাটা কি জানেন ? সুমিত্রার সঙ্গেই আমি আপনার বিবাহ দিতে চেয়েছিলাম। তবে ওর বাবা তারকের অবস্থা ভাল নয় শুনে পাছে আপনি পিছিয়ে যান, তাই সীমার নাম করে আপনাকে এখানে আহ্বান করে এনে সুমিত্রাকে দেখিয়েছি। আসল কথাটি এখন বুঝতে পারলে ত ? এবার অনুমতি দিলে দেনা-পাওনার কথাটা পাকাপাকি করি।

অনিমেষ বলে ঃ বাঃ, এমন খাসা উপস্থিত বুদ্ধি না হলে কি আর কেউ রাতারাতি অবস্থা ফিরিয়ে বড়মানুষ হতে পারে? কিন্তু ক্ষেত্রবাবু, সুমিত্রাকে বিয়ে করতে হলে আমরা তারকবাবুর সঙ্গেই দেনা-পাওনা নিয়ে কথা কইব।

ক্ষেত্রবাবুকে নীরব দেখে অবনী পুনরায় বলে ঃ তবুও আপনার ভাগ্নীকে একবার আমরা দেখতে চাইছি ক্ষেত্রবাবু!

অনিমেষ ঃ আচ্ছা, ভাগ্নীকে একবার দেখাতে এত আপত্তি কেন আপনার শুনি?

ক্ষেত্রনাথ বললে ঃ তাহলে শুনুন, তার না আছে রূপ, না আছে গুণ। আপনাদের সামনে তাকে বার করতে আমি লজ্জা পাচ্ছি।

অনিমেষ শ্লেষের সুরে বলে ঃ বলেন কি? আপনিও তাহলে লজ্জা পান?

অবনী ক্ষেত্রনাথকে বলে ঃ তাহলেও যে মেয়েটিকে নিয়ে এত কাণ্ড, তাঁকে আমরা একবার দেখব, আপনাকে তার জন্য লজ্জা পেতে হবেনা।

তবু ক্ষেত্রনাথ ইতস্ততঃ করছেন দেখে অনিমেষ বলল ঃ তবে আর আপনার আপত্তি কেন?

এই সময় সুমিত্রা বললে ঃ সীমাকে দেখার জন্য আপ।ন যখন এত ব্যাস্ত, বেশ আমিই ওকে নিয়ে আসছি।

বলেই সে উঠে গেল।

ভিতরের ঘর থেকে মনোরমা তখন সব কিছু লক্ষ্য করে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। ঘর ছাঁট দিতে দিতে সীমাও বাইরের অবস্থাটা উপলব্ধি করছিল। সুমিত্রা তাকে সেই অবস্থাতেই বাহিরের ঘরে আনবার জন্য টানাটানি করতে থাকায় সীমা বললে ঃ আমি সব শুনেছি, চল, যাচ্ছি।

বিনীতভাবে মুখখানা নীচু করে সে বৈঠকখানায় এসে সমবেতদের

উদ্দেশ্যে নমস্কার করল—মামার পদধূলি নিল। নাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করবার পর সুকৌশলে অনিমেষ মুঙ্গেরের কথা তুলল।

ক্ষেত্রনাথ তৎক্ষণাৎ বললেন : আর বলেন কেন ? ভগ্নীপোতের অসুখের খবর পেয়েই সেখানে ছুটে যাই। কারবার ছিল নামেই। কেউ কিছু উপুড় হস্ত করলে না। উল্টে সব দেনাপত্তর শুদ্ধু ই মেয়েটাকে নিয়েই এখানে এলাম। সেই থেকেই পুষছি।

অবনী বললেন : তিনি নাকি মুঙ্গেরে খুব নামজাদা লোক ছিলেন ? ক্ষেত্রনাথ বললেন : মিছে কথা, অত্যন্ত সাধারণ স্তরের লোক ছিলেন সীমার বাবা উপেনবাবু।

সীমা বারেক ক্ষেত্রনাথের দিকে তাকিয়ে কি বলতে গিয়ে চেপে গেল। অবনী সেটা লক্ষ্য করে বললে : তাহলে এটাই কি সত্যি যে, আপনার বাবা আপনাকে নিঃস্ব ও পরাশ্রিত করে রেখে গেছলেন ?

সীমা এবার দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করল : মামা যা বললেন, তা সত্যি নয়। মুঙ্গেরের সেই সাধারণ স্তরের লোকের বিষয়-সম্পত্তি থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা এনেছিলেন।

ক্ষেত্রনাথ হেসে লুটিয়ে পড়বার মত হয়ে বলেন : শুনলেন ত' ? কি অকৃতজ্ঞ বেহায়া মেয়ে দেখুন। যার খেয়ে মানুষ, তাকেই কিনা সবার সামনে খোঁটা দিলে। সাড়ে তিন পয়সাও তোমার বাবা রেখে যান নি।

অবনী তখন নোটবইখানা পকেট থেকে বার করে বললেন : এই নোটবইখানা কিন্তু সীমা দেবীর কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। আপনার নিজের হাতের লেখা নোটবই।

বইখানা খুলে ক্ষেত্রনাথের সামনে ধরলে। ক্ষেত্রবাবু ঘাবড়ে গিয়ে বলেন : এ বই আপনি কোথায় পেলেন ?

অবনী বলে : সীমা দেবীর যথার্থ হিতৈষী কোন লোক আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন। কিন্তু ক্ষেত্রবাবু, যে ভাবে আপনি

নোটবইখানা ফেঁদেছেন নিজের হাতে, তাতে মামলা করে সীমা দেবী এ টাকা কিন্তু আদায় করতে পারেন।

ভেঙ্গে পড়বার মত হয়ে ক্ষেত্রনাথ বলেন : কি সর্বনাশ! খেলার ছলে মিথ্যে করে যে খাতাখানা লিখে ছিলাম, সেটা হাতে পেয়ে আপনারা একটা ফ্যাঁসাদ বাধাতে চান। তবু যদি এর কিছুটা সত্যি হত! আমার সেই উড়োনচণ্ডে হা-ঘরে দেনদার ভগ্নীপতিকে সাক্ষী না মেনে আর উপায় নেই দেখছি।

সীমা প্রগাঢ় দৃষ্টি মামার মুখে নিবদ্ধ করে জিজ্ঞাসা করল : তাহলে এখনো আপনি বলতে চান মামাবাবু—আমার বাবা হা-ঘরে, উড়োন-চণ্ডে, দেনদার, নিঃস্ব ছিলেন? আপনি বলছেন এ খাতাখানা বাজে?

গলায় জোর দিয়ে ক্ষেত্রনাথ বলে : হ্যাঁ আমি বলছি—তোমার বাবা নিঃস্ব অবস্থায় মরেছেন। খেয়ালের বশে আমি ঐ খাতায় তাকে টাকাওয়ালা মানুষ বলে মিথ্যে একটা অঙ্ক ফেঁদেছিলুম—ওর সব মিথ্যে। এখন অবিশ্যি আমার পক্ষে ওটা মৃত্যুবাণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাধ করে কি তোমার মরা বাবাকে সাক্ষী মানছিলুম।

সীমা স্থির হয়ে শুনলো, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে দৃঢ়স্বরে বলল : আমার বাবা, যাঁকে আমি ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে আসছি বরাবর, তিনি একথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। আপনিও তাঁকে সাক্ষী মেনেছেন। তাঁর দিক থেকে আপনার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার মত প্রমাণ না আসা পর্যন্ত ঐ দলিল ওঁরা বাজে ভেবেই চেপে রাখবেন—এ অনুরোধ আমি করে যাচ্ছি।

কথাগুলি বলেই সীমা চলে গেল।

অবনী বলে : ক্ষেত্রবাবু, আপনার ভাগ্নীর কথাবার্তা শুনে মনে হল উনি বেশ শিক্ষিতা। কথা বলেন অল্প, কিন্তু প্রত্যেক কথাটি যেন বন্দুকের বুলেট।

ক্ষেত্রনাথ বলেন : ও কথা আর বলেন কেন—সারাদিন মুখে বই গুজে বসে থাকেন।

অবনী বলে: সেই অবস্থায় কলতলায় বসে বাসন মাজতেও ভালবাসেন বলুন। আচ্ছা আমরা আজ তাহলে উঠি।

ক্ষেত্রনাথ বলেন: তাহলে ঐ নোটবইখানা…

অবনী বলে: আমার কাছেই থাক। যিনি গচ্ছিত রেখেছেন, তাঁকেই ফেরত দেওয়া যাবে।

(৩৪)

সীমা বাড়ির ভেতরে যেতেই সুমিত্রাও তার পিছনে পিছনে গিয়ে বলল: ধন্যি মেয়ে বাবা তুমি, মরা বাপকে সাক্ষী মেনে বসলে সবার সামনে, লজ্জা করলোনা ও কথা বলতে?

সীমা বলল: আমার বাবাকে যখন আমি পরম দেবতা জ্ঞানেই পূজা ভক্তি করি, এত বড় সঙ্কটে তাঁকে ছাড়া আর কাকে ডাকবো! এতে লজ্জার কি আছে বুঝিনা?

সুমিত্রা বলে: বাইরে লোকসমাজে ত বেরোওনি কখনো, কাজেই হিসেব করে কথা বলতেও শেখনি—লজ্জার মর্ম তুমি কি বুঝবে বল?

সীমা বলে: অন্যের নাম ভাঁড়িয়ে নিজেকে চালিয়ে দিতে যার লজ্জা হয়না, সে রকম বেহায়ার কাছে আমাকে যেন লজ্জা শিখতে না হয়।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলেই সীমা সেখান থেকে চলে গেল।

মনোরমা একপাশে দাঁড়িয়ে নীরবে কথা শুনছিলেন; হঠাৎ সুমিত্রার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে বলল: শুনলেন কাকিমা, আপনার ভাগনীর তেজের কথা? ওর ভালর জন্যেই আমাকে এনেছিলেন, কিন্তু আমাকে ও এখন শত্তুর ঠাওরেছে!

মনোরমা বললেন: আমি কাঠ হয়ে ওর কথা শুনছি মা, ইচ্ছে করছিল ঝাঁট গাছাটা এনে আচ্ছা করে ওর আগা পাছতলা—

ক্ষেত্রনাথ এই সময় সেখানে এসে গৃহিনীর কথায় বাধা দিয়ে

বললেন ঃ আ! থামো। এখনো দেখছি তোমার চোখ ফোটেনি—আক্কেল হয়নি! মনের ইচ্ছাটা নাই বা সবার কাছে খুলে বললে! অবনীবাবু যাবার সময় কি বলে গেল শুনবে—

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল ঃ সেকি! ওঁরা এরই মধ্যে চলে গেলেন নাকি? তবে যে শুনেছিলাম জল-টল খেয়ে—

ক্ষেত্রবাবু বললেন ঃ জলটল ওঁরা আজ খাবেন না, আসছে রোববার যখন আসা হচ্ছে– সেই দিনই ওপাঠ হবে।

সুমিত্রার চোখ দুটো চকচক করে উঠল, সেই সঙ্গে ঝংকার দিয়ে উঠল ঃ বুঝিছি! আচ্ছা আমি দেখছি।

কথাকটা বলতে বলতেই সে এক রকম ছুটে বেরিয়ে গেল।

মনোরমা বললেন ঃ কি হল ওর?

ক্ষেত্রনাথ বললেন ঃ গায়ে এখন জ্বালা ধরেছে। ডুবে ডুবে জল খাওয়াই সার হয়েছে—হতভাগীর রূপের আলো নিবিয়ে দিয়েছে তোমার ঐ কালো কুৎসীত ভাগিনী! একেই বলে ভবিতব্যের খেলা।

মনোরমা মুখখানা বিকৃত করে বললেন ঃ যাবার সময় কি বলে গেল বলেছিলে না? কি বলে গেল শুনি?

ক্ষেত্রনাথ বললেন ঃ আসছে রোববার বিকেলে অবনীর পিসিমা সীমাকে দেখতে আসছেন, তাঁর পছন্দর উপরই নাকি সব নির্ভর করছে।

একটা ঢোক গিলে মনোরমা বললেন ঃ হুঁ—

ক্ষেত্রনাথ জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন ঃ যে আশায় এত ফিকির করলাম, সবই ফাঁক হয়ে গেল। তবে যদ্দুর বুঝছি, তোমার ঐ কালিন্দী ভাগনীর অদৃষ্টেই সিকে ছিড়বে! তারপর হয়ত ঐ নোট বুক নিয়ে—

চোখ দুটো পাকিয়ে মনোরমা তর্জন করে উঠলেন ঃ তুমি থামো, ঐ পুরোনো খাতার নাম উঠলেই মাথা আমার গুলিয়ে যায়! আমিই জোর করে—গাল মন্দ দিয়ে ঐ অভাগীকে পুরোনো আলমারির

কাগজগুলো ঝাড়াবাছা করতে বলেছিলুম! কে জানত, ওর ভেতর থেকেই···আর তুমিও যে এমনি আহাম্মুখ, খাতাখানা—

কপালে করাঘাত করে ক্ষেত্রনাথ বলে উঠেন: বরাত, বরাত—

(৩৫)

বাড়ীর বাইরে কিছুটা দূরে বড় রাস্তা। অবনীবাবুরা মোটরে উঠে বসেছেন, এমন সময় সুমিত্রাকে বাড়ির দিক থেকে দ্রুত পদে আসতে দেখা গেল। মোটরের হর্ণ বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে সেও জোর গলায় জানা'ল: একটু দাঁড়ান—কথা আছে।

অনিমেষ চাপা গলায় মন্তব্য করল: কাঁটালের আটা যেন ছাড়তে চায়না।

সুমিত্রা কাছে আসতেই অবনী জিজ্ঞাসা করল: বলবে কিছু?

গম্ভীর মুখে সুমিত্রা বলল: আমাকে কিছু না বলেই চলে যাচ্ছেন যে—এটা কোন্ দেশী ভদ্রতা শুনি?

অবনী বলল: ওখানে যা বলা হয়েছে তার ওপর তোমাকে কিছু বলাটাই অভদ্রতা। এর পর যা বলবার আছে, তোমার বাবা ও মাকে বলে পাঠাব।

বিকৃত কণ্ঠে সুমিত্রা বলল: বলে পাঠাব! তার মানে—

অবনী আস্তে আস্তে জানিয়ে দিল: আমার এক পিসিমা আছেন, তিনিও প্রকাণ্ড এক এষ্টেটের মালিক, আর আমার অভিভাবিকাও তিনি। তাঁর ইচ্ছা, তিনি নিজে পছন্দ করে আমার কনে ঠিক করবেন। আমি তাঁকে আমাদের ব্যাপারটা সবই খুলে বলেছি। আসছে বুধবার তিনি তোমাদের বাড়িতে যাবেন প্রথমে। তার পরের রবিবার আসবেন এখানে।

অনিমেষ এই সময় বলে উঠল: এখন দেখা যাক, কোন বিড়ালের বরাতে সিকে ছেঁড়ে—যে হেতু তাঁরই পছন্দের উপর সব নির্ভর করছে।

অবনী এর পর কথাটার উপসংহার করল এ ব'লে : পিসিমা তোমার বাবার কাছে এ খবর পাঠাবেন। আচ্ছা, এখন চলি।

মোটর চলে যায়। সুমিত্রা এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে।

(৩৬)

হাওড়া। অবনীর বাড়ি। পিসিমার ঘর। ভবতারিনী আহ্নিকের আসনে বসে কথা বলছেন অবনীও অনিমেষের সঙ্গে। ভবতারিণী বলেন : এ তোর বিয়ে না করবার মতলব। এই যদি তোর ইচ্ছা ছিল—আমার পছন্দে তোর পছন্দ, তাহলে এ্যাদ্দিন বলিস্‌নি কেন শুনি ?

অনিমেষ : ওর হয়েছে পিসিমা—বাঁশ বনে ডোমের অবস্থা। ব্যারাকপুরে মেয়ে দেখতে গিয়ে ওদেরই এক আত্মীয়ের মেয়ের রূপে আকৃষ্ট হয়। এখন দোটানায় পড়েছে। তাই বরাত ঠুকে তোমার ওপরেই সব ছেড়ে দিয়েছে। তুমি যাকে পছন্দ করবে, অবনী তাকেই চোখ বুজিয়ে বিয়ে করবে—এই কথাই পাকা।

ভবতারিণী : শোন কথা। আমাকে আবার এসব হাঙ্গামার মধ্যে জড়ানো কেন বাপু। আমার কি পছন্দ আছে যে—

অবনী এই সময় বলে : তুমি যদি ওদের কাউকে পছন্দ না কর পিসিমা আমিও কাউকে বিয়ে করবো না। আমি শুনেছি বৌ পছন্দ করতে আর তাকে মানিয়ে নিতে তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা, তাইত বাবা যতগুলি মেয়ে দেখেছিলেন তোমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হয়েছিল। তার পর, শুনেছি মেয়ে পছন্দ করার ভার বাবা তোমার ওপরেই দিয়ে যান। তুমি সরে দাঁড়াতেই ত' এই ফ্যাসাদে পড়া গেছে। পিসিমা বলেন : ইচ্ছে করেই আমি সরে দাঁড়িয়েছি—আমার পছন্দ করা মেয়ে যদি না তোর মনে ধরে এই ভেবে। আমরা জেনে এসেছি, উঠন্তি ঘরে মেয়ে দেবে আর পড়ন্তি ঘরের মেয়ে আনবে ছেলের জন্যে। যে বংশ বাড়বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে—মেয়ে সেখানে

পড়লে সুখী হয়। আর যে বংশ এককালে বনেদি আর বর্ধিষ্ণু ছিল, এখন নামটাই আছে এদিকে টানাটানি, তাহলেও সেই বংশের মেয়ে আনলে সংসার ভরে উঠে।

অবনী : এখানেও ছুই বংশের মেয়েছুটোকে দেখে তুমি পছন্দ কর।

ভবতারিণী পুনরায় বলেন : তবে একথা বলে রাখছি বাপু, হা-ঘরে কিংবা পরের আশ্রয়ে থেকে মানুষ হয়েছে, এমন মেয়ে যতই রূপসী আর গুণবতী হোক না কেন, আমি তাকে বৌ করব না।

অবনী : পছন্দর ভার যখন ছেড়ে দিচ্ছি তোমার ওপর, আর কথা কি।

ভবতারিণী : বেশ তাহলে খবর দে—তিন দিন আড়াআড়িতে ছুটো মেয়েকেই দেখবো।

অবনী : হ্যাঁ, এক জায়গায় আসছে বুধবার, আর এক জায়গায় রোববার।

(৩৭)

তারকবাবুর বাড়ির বাইরের ঘর। ভবতারিণী সুমিত্রাকে দেখতে বসেছেন। খুব খাতির করে তাঁকে বসান হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আরও ছুটি মহিলা এসেছেন। বাড়ির দরজা থেকে এইটু দূরে রাস্তার কিনারা ঘেঁসে অবনীর প্রকাণ্ড মোটরখানা দাঁড়িয়ে আছে। মোটরের মধ্যে অবনী ও অনিমেষ। নিরুপমা সুসজ্জিতা সুমিত্রাকে নিয়ে বৈঠকখানায় এলেন। কন্যাকে ইসারা করা সত্ত্বেও সে ভূমিষ্ঠা না হয়ে ভবতারিণীকে নমস্কার করে তাঁর সামনে বসল। সময় অপরাহ্ণ।

ভবতারিণী কন্যার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে সুধালেন : তোমার নাম কি ?

সুমিত্রা মুখ টিপে হেসে বলল : আমার নাম কি এখনো শোনেননি ?

কন্যার কথায় পিতা ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

ভবতারিণী : কি করে শুনব—এই ত' তোমাকে প্রথম দেখছি মা।

সুমিত্রা কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ করে বলল : কিন্তু যার জন্য আমাকে দেখতে এসেছেন, এ নাম তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। তাহলেও আপনি শুনুন, আমার নাম—মিস্ সুমিত্রা। মিত্রা হলেই ভালো হতো, আমার বাবা মা দু'জনেই সেকেলে, তাই পুরনোকে ফলো করেছেন।

ভবতারিণী : তুমি বুঝি খুব লেখাপড়া শিখেছ মা?

সুমিত্রা মোটামুটি শিখেছি, তবে লেখাপড়ার চেয়ে নাচগানটাই বেশি করে আর ভাল করে শিখেছি। এখানে নাচগানের ব্যবস্থা সব আছে, বলেন তো তার পরীক্ষা দিই।

ভবতারিণী : আমি নিজে যখন নাচ গান জানিনা, পরীক্ষা কি করে নেব বল? তার চেয়ে আমার যে-সব বিদ্যা জানা আছে আর কাজে লাগে, তারই পরীক্ষা দাও।

সুমিত্রা : সেগুলো কি?

ভবতারিণী : এই ধর—ঘরকন্না, সেবা-যত্ন, পূজাপাঠ।···রাঁধতে জান?

সুমিত্রা হেসে ফেটে পড়ার মত হয়ে বলে : অতবড় নামী মানী জমিদারের বাড়ির বউ হয়ে আমাকে কি তাহলে হেঁসেলে ঢুকে রাঁধতে হবে?

ভবতারিণী : রান্না জানা না থাকলে, রাঁধুনির রান্নার বিচার করবে কি করে? আমাদের মতে মেয়েদের এইটেই সেরা বিদ্যা! এখন আমার কথার জবাব দাও।

সুমিত্রা : তাহলে বলি শুনুন, রান্নাঘরে উনুনের সামনে কোনদিন বসিনি, সে শিক্ষা পাইনি আর নেওয়াও উচিত মনে করিনি। তবে স্টোভের আঁচে চা, টোস্ট, ডিমের ওমলেট এসব তৈরি করতে পারি।

ভবতারিণী : শুক্তো রাঁধতে জান?

সুমিত্রা : সেই তেতো ক্যাডাভারাস তরকারিটা—ওর নাম

শুনলেই বমি আসে। বলছি তো ওসব রান্না আমার আসে না।

ভবতারিণী : ঘরকন্নার কাজ, সেবা-যত্ন, পূজাপাঠ—এ সব জানা আছে ?

সুমিত্রা : ঘরকন্নার কাজ, সেবা-যত্ন, চাকর-দাসীই ত' করে, আর পূজাপাঠের জন্য থাকে পুরুত। ওসব কাজ কখনো করিনি। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি—আমাদের দেখাশোনা বোঝাপড়া, মায় বাগ্‌দান পর্যন্ত যখন হয়ে গেছে, তখন আবার এভাবে কেঁচে গণ্ডুষ কেন ? এসব কথা জিজ্ঞেস করবার কোন সার্থকতা আছে ?

ভবতারিণী : আছে বৈকি, নৈলে আমি এসেছি কি করতে ? অবনী জানতনা, আমার অমতে তার কনে পছন্দ করবার কোন অধিকার নেই। উইলে ওর বাবা সে ভার আমার ওপর দিয়ে গেছে।

এই সময় নিরুপমা বললেন : কিন্তু সুমীকে ওঁর পছন্দ হয়েছে, তিনি ওর সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেছেন—

ভবতারিণী : মা হয়ে আপনি অতটা আলগা দিয়েছিলেন কেন ? আমাদের সমাজে বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর মেলামেশার রেওয়াজ আছে কোথাও ? আপনি দেখছি মেয়ের সুশিক্ষা কিছুই দেননি।

তারকবাবু : আপনি ওকে দয়া করে গ্রহণ করুন—নিজের ইচ্ছামত শিক্ষা দিয়ে ওকে গড়ে-পিঠে ভাল করে তুলুন।

ভবতারিণী : আপনাদের মেয়ে তো সোনার প্রতিমা, দেখলেই পছন্দ হয়। কিন্তু আপনারা একে লক্ষী প্রতিমা না করে নাচের পুতুল করে রেখেছেন। আচ্ছা আমি ত' দেখে গেলাম। আর একটি মেয়ে দেখবার আছে, তার পর আমার মত জানাব।

(৩৮)

হাওড়া—অবনীর বৈঠকখানা। বন্ধুদের সঙ্গে অবনী পিসিমা ভবতারিণী সম্বন্ধেই আলোচনা করছে। পাত্রী নির্বাচনের ভার তিনিই

নিয়েছেন, দেখেও এসেছেন, কিন্তু সীমা মেয়েটিকে না দেখা পর্যন্ত তিনি নিজের মত প্রকাশ করবেন না। পিসিমা ইদানীং পূজাপাঠ নিয়ে থাকলেও আসলে তিনি যে কেমন শক্ত মানুষ, পিসিমা সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল অনিমেষই সেটা ব্যক্ত করছিল।

অনিমেষ : পিসিমা যখন এ ব্যাপারে হাত দিয়েছেন আর ভাবনা নেই। উনি বাঁশ বনে ডোমকানা হবার পাত্রী নন ! যাচাই করে আসল মালটিকেই বেছে নেবেন—কোন্‌টি হীরে, কোন্‌টি জীরে !

জনৈক বন্ধু : হাজার হোক উনি মেয়েমানুষ, ক্ষেত্রবাবুর মতন—

অনিমেষ : আজ পিসীমা পূজা-আচ্ছা নিয়ে পড়েছেন, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর শক্ত হয়ে যখন জমিদারি শাসন করতেন, অমন কত ঘাগী লোককে দুরস্ত করে ছেড়েছেন। ইদানীং সরকারের হাতে জমিদারি যেতেই না তিনি অবনীর বাবার অনুরোধে এ-সংসারের ভার নেন। ওঁর তো আর ছেলে-পুলে নেই—অবনীই সব।

অবনী : অবনীরও টিকি বাঁধা পিসিমার কাছে। ওঁর মত না নিয়ে কোন কিছুই করবার অধিকার আমার নেই—ওদিক দিয়ে পাকা বন্দোবস্ত করে গেছেন বাবা! আর পাত্রী দেখা ব্যাপারে বাবা বরাবর পিসিমাকেই সঙ্গে নিয়ে যেতেন—কত মেয়েই দেখেছেন, কিন্তু কাউকে পছন্দ করেননি। চোখ বুজোবার আগে পিসিমার ওপরে ও ভারটা চাপিয়ে যান। তবে পিসিমা আর ওর মধ্যে না গিয়ে তলে তলে সন্ধান নিয়ে তোদের সঙ্গে করে আমাকেই পছন্দ করতে পাঠান। কিন্তু প্রথম পদক্ষেপেই কি রকম উল্টো উৎপত্তি হয়েছে—সেতো দেখতেই পাচ্ছি। কাজেই আবার সেই পিসিমাকেই কেঁচে হাল ধরতে হলো !

বন্ধুদের মধ্যে আর একজন সুধাল : শুনলাম, বালিগঞ্জে সুমিত্রাকে তিনি দেখে এসেছেন। কিছু বলছেন সে সম্বন্ধে ?

অবনী : না। পিসিমা এখন কিছু বলবেন না। দুটি মেয়েকে দেখবার পর ওঁর অভিমত জানাবেন। উনি যাকে পছন্দ করবেন,

মুখ বুজিয়ে আমাকে মেনে নিতে হবে। যদি দু'জনকেই বাতিল করেন, তাতেও আমার বলবার কিছু থাকবেনা।

অনিমেষ : তবে আমার বিশ্বাস, তাঁর চোখে আসল মেকি ধরা পড়বেই। অবনী : একটা কথা কিন্তু পিসিমাকে বলা হয়নি—সেই খাতার ব্যাপারটা, যাকে আমরা ক্ষেত্রবাবুর মৃত্যুবাণ ধরে রেখেছি। তোমরাও যেন কথাটা তাঁর কাছে ভেঙনা।

অনিমেষ : না, না, এখন ওকথা না তোলাই ভাল। তারপর, ঐখাতা থেকে ক্ষেত্রবাবুকে দায়ী করাও যাবেনা ; হ্যাঁ, তবে যদি ও ব্যাপারে কোনো জোরালো সাক্ষী পাওয়া যায়, তাহলে হয়ত—

ডাকঘরের ছাপ দেওয়া একখানা সাদা খাম নিয়ে ভৃত্য প্রবেশ করল এবং অবনীর হাতে দিয়ে চলে গেল। বন্ধুরা উৎসুক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাল। খামখানা খুলে অবনী নীরবে পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে তার মুখখানা আরক্ত হয়ে ওঠে।

বন্ধুরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

অনিমেষ : আবার কে চিঠি লিখল ?

অবনী : সুমিত্রা। সে এবার মোক্ষম অস্ত্র হেনেছে—

চিঠিখানা বন্ধুদের সামনে ফেলে দিল অবনী! অনিমেষ তুলে নিয়ে পড়ল : "আশ্চর্য, হালে পানি পেয়েও হালকে হেলা করে চলেছ ! কোথা থেকে এক পিসিমাকে আমদানি করেছ—সেকেলে পচা মনোবৃত্তি নিয়ে আমাকে যাচাই করতে আসে। বেশ কড়া করে স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিয়েছি মুখের ওপর। আচ্ছা—আমাদের দেখা-দেখি জানাশোনা মেলামেশা সবই যখন পাকা হয়ে গেছে, আবার নতুন করে এসব কেন ? এত দূর এগিয়ে পড়ে আর কি পিছিয়ে যাবার পথ আছে ভেবেছ ? এখন আমার স্রেফ কথা—যদি এ বিয়ে না হয়—হাটে আমি হাঁড়ি ভেঙে দেব ; জানো—আজ আমি তোমার ছেলের মা ? ভাল চাও ত', বিয়ের দিন ঠিক করে নিজে বাঁচ, আমাকেও বাঁচাও। ইতি—তোমার সুমিত্রা।"

চিঠি শুনতে শুনতে অন্যান্য বন্ধুরা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে অবনীর দিকে তাকাতে থাকে। পড়া শেষ হলে একজন চড়া সুরেই বলে বসল ঃ তুমি রূপের মোহে এতদূরে নেমে গেছ অবনী—

আরও দু-তিন জন বন্ধু ছি! ছি! করে ওঠে!

অবনী ঃ আমাকে বিশ্বাস কর—যে কোন শক্ত শপথ করে আমি বলতে পারি—এত নীচ আমি নই…আমি…আমি…আমি…

অনিমেষ ঃ থাম তুমি, শপথ করতে হবেনা। আমি জানি—আমি বিশ্বাস করি—যে বংশের তুমি ছেলে, সেখানে এমন অনাচার হতে পারেনা। সুমিত্রার মত মেয়েরা সব করতে পারে। এই জন্যই তখন আমি সংযত হতে বলেছিলাম অবনী। প্রথম দিন ওকে দেখেই—

অবনী ঃ কিন্তু এখন উপায়? যদি সুমিত্রা—

অনিমেষ ঃ এর উপায় আমাদের হাতে নেই। সৌভাগ্যের বিষয় যে পিসিমার হাতে সব ছেড়ে দিয়েছ। যা করবার তিনিই করবেন। তুমি যখন নির্দোষ, কুচপরোয়া নেই। আর তোমরাও শোন, অবনীকে যখন বন্ধু বলে মানো, ওর ভেতরটা চেনবার চেষ্টা করা উচিত।

৩৯

ব্যারাকপুর—ক্ষেত্রনাথের বাড়ির ভিতর মহলের একখানি বড় ঘর। ভবতারিণী সীমাকে দেখতে এসেছেন—পূর্ব সঙ্গিনী ভদ্রমহিলা দুটিও সঙ্গে এসেছেন। জোড়া তক্তপোষের ওপর সতরঞ্চি ও যাজিম পেতে তার ওপর অভ্যাগতাদের বসবার ব্যবস্থা হয়েছে।

সীমা একখানা ফরসা কাপড় ও সাদাসিধা একটা ব্লাউজ পরে এঁদের সামনে এসে বসেছে। মনোরমা, তাঁর মেয়েরা, প্রতিবেশিনী মহিলারা কেউ কেউ তক্তপোষে বসেছেন, কেউ কেউ বা দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ভবতারিণী ঃ বাঃ, মুখখানি তো দিব্যি—দেখেই মনে হয় যেন

লক্ষ্মীশ্রী মাখানো। কিন্তু গায়ের রঙটা যে ময়লা মনে হচ্ছে। পেণ্ট তো করেন নি দেখছি—পাউডারও মাখিয়ে দেননি ?

মনোরমা ঃ সবই তো রয়েছে—মেয়ে তেজ দেখাতে মাখেননি কিছু। রেশমী জামাকাপড় পর্যন্ত পরেননি—আধময়লা শাড়ি-ব্লাউজ পরে আসছিল—পীড়াপীড়ি করতে···কি ভাগ্যি ও দুটো ছেড়ে আমার মাথা রক্ষা করতে এসেছেন।

ভবতারিণী এতক্ষণ এক দৃষ্টিতে সীমাকে দেখছিলেন, এই সময় মৃদু হেসে সুধালেন ঃ কেন মা, তুমি কি জানতে না—বিয়ের বয়েস হলেই মেয়েকে দেখতে আসে, আর সে সময় সাজিয়ে-গুজিয়েই মেয়ে দেখানো হয় ?

সীমা ঃ আমার মনে হয়, যে মেয়ের আত্মসম্মান জ্ঞান ও ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকে, তার উচিত—সাজগোজ করে রং-পাউডার মেখে পরীক্ষা দিতে না এসে সাদাসিধে শাড়ি-ব্লাউজ পরে স্বাভাবিক চেহারায় রূপের পরাক্ষা দেওয়া। পরে এর জন্যে আর খোঁটা খেতে হয় না।

মনোরমা ঃ শুনছেন মেয়ের কথা। আমরাও একদিন আইবুড়ো ছিলুম—দেখতে এলে যেমন নিয়ম আছে, সেই ভাবে সেজেগুজে আসতুম।

ভবতারিণী ঃ সত্যিই—অনেক মেয়ে আমরা দেখেছি, কিন্তু দেখতে গিয়ে কোন মেয়ের মুখে এতবড় একটা দামী কথা শুনিনি। এই বয়সেই এমন ন্যায়-অন্যায় বোধ—

মনোরমা ঃ ও সব হচ্ছে আধিখ্যেতা—এঁচোড়ে পাকালে এমনি ডেঁপো হয়।

ভবতারিণী ঃ তোমার নাম কি মা ?

সীমা ঃ শ্রীমতী সীমা দেবী।

ভবতারিণী ঃ আপনার—

মনোরমা ঃ ভাগ্নী হয়। আর বলেন কেন—চার বছরের মেয়েকে রেখে একদিনের আড়াআড়িতে বাপ-মা দু'জনেই চোখ বুজোলেন।

ভাগ্যিস্ উনি সে সময় ছিলেন সেখানে—ওনাদের সদ্গতি করে দায়দফার সঙ্গে মেয়েটাকে ঘাড়ে নিয়ে আসেন—সেই থেকে পুষছি আমরা।

ভবতারিণী : ওমা! তাই নাকি? তা অসুখটা কি হয়েছিল যে ওভাবে—

মনোরমা : যেমন হতচ্ছাড়া জায়গা, তেমনি রোগে—পেলেগ, পেলেগ!

ভবতারিণী : তাহলে বাংলাদেশের বাইরে বলুন—

মনোরমা : হ্যাঁ, পোড়া পশ্চিমে—কি একটা জায়গা···

ভবতারিণী : তুমি তাহলে পশ্চিমে জন্মেছ?

সীমা : হ্যাঁ, সে জায়গার নাম মুঙ্গের। বাবার সেখানে মস্ত কারবার—

মনোরমা : থাক, আর সে গরিমায় কাজ নেই। মস্ত কারবার না ছাই! তাহলে এ দশা হয়—

সীমা : আমার ঘাট হয়েছে মামিমা। সেদিনই আমি বড় মুখ করে বলেছি—আমার বাবার কারবার, মান-সম্ভ্রম ছিল কিনা, যদি ভগবানই না জানিয়ে দেন, আমি নিজে থেকে কিছু বলব না। কথাটা মনে ছিল না, আমাকে মাপ করুন।

ভবতারিণী : রোসো। আমি যা জিজ্ঞেস করি বল তো মা মুঙ্গেরের নাম উঠেছে বলেই জানতে চাইছি। তোমার বাবার নাম—

সীমা : ঈশ্বর উপেন্দ্র নাথ ঘোষাল।

নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তকরে স্বর্গত পিতার উদ্দেশে প্রণাম করল সীমা।

ভবতারিণী : অ্যাঁ—তুমি ঘোষাল মশায়ের মেয়ে? মুঙ্গেরে যাঁর মস্তবড় অভ্রের কারবার ছিল?

সীমা : হ্যাঁ, শুনেছি তিনি ঐ ব্যবসাই করতেন। তখনকার সুখের কথা এখনো একটু একটু মনে পড়ে স্বপ্ন দেখার মতন।

ভবতারিণী : তাহলে আমি তোমাকে ছোটবেলায় সেখানে দেখেছি। তোমার বাবা খুব ঘটা করে ভাত দেন—আমরা নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি তোমাদের বাড়িতে। তোমার বাবা সত্যিই সেখানে খুব মানী ও নামী লোক ছিলেন। তাহলে তোমার—

মনোরমা : হ্যাঁ, ওঁদের কাছেই শুনেছি—দিনকতক খুব বেড়েছিলেন—তারপর সর্বস্ব উড়িয়ে পুড়িয়ে—

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভবতারিণী মনোরমার মুখভঙ্গি দেখে বুঝি মনোভাব কতকটা জানতে পারেন। এরপর মনে মনে কি ভেবে প্রসঙ্গটা চেপে রেখে তিনি সহজভাবেই বললেন তা হবে! অনেকদিনের কথা —সবও আমার মনে নেই। ঐ দুর্ঘটনার সময় আমরা আবার কাশীতে ছিলাম। মুঙ্গেরে তখন প্লেগের হিড়িক চলেছে। সেই ভয়ে আমরা গোড়াতেই কাশী যাই। ঘোষালমশায়েরও কাশী যাবার কথা ছিল; কিন্তু কি একটা লেনদেনের ব্যাপারে যাওয়া হয়নি। ছ'মাস পরে ফিরে এসে সব শুনে আর কেঁদে বাঁচিনে। দু'জনেই গেছেন, কোন আত্মীয় এসে মেয়েটিকে নিয়ে গেছেন, তাঁর বলতে আর কিছু নেই। এখন জানছি—তাঁর সেই আত্মীয় আপনারা আর সেই মেয়েকেই আমি দেখতে এসেছি।

কথাগুলি বলেই ভবতারিণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

এই সময় বাইরের ঘরে একটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে ক্ষেত্রনাথ উৎকর্ণ হয়ে ভিতরের কথাগুলি শুনছিলেন। আবার পড়ার ঘরে পাইচারি করতে করতে ভানুও কনে দেখার ব্যাপারটা আগাগোড়াই মনোযোগ দিয়ে খোলা গবাক্ষপথে লক্ষ্য করছিল।

হঠাৎ ভবতারিণী সীমার হাত দু'খানি ধরে সস্নেহে কোলের উপর রেখে টিপে টিপে দেখে বললেন : খুব খাটতে হয়—না মা? হাত দেখেই বুঝেছি। বাসন মাজা, বাটনা বাটা, জল তোলা, তার ওপর রান্নাবান্না—সবই করিয়ে নেন তো আপনার ঘাড়েপড়া ভাগ্নাকে দিয়ে?

মুখখানা শক্ত করে মনোরমা উত্তর করেন : গেরস্তঘরের মেয়েকে

সবই করতে হয়, দাসী-চাকর রাখবার ক্ষমতা না থাকলে, কি করা যায় বলুন ?

ভবতারিণী : তা তো বটেই।

এরপর সীমার পুরন্ত খোঁপাটি ভবতারিণী একটু টিপতেই সীমা বলল : খুলে দিচ্ছি খোঁপাটা—

ভবতারিণী : না, না—খোঁপার চেহারা দেখেই বুঝেছি—পীঠ ঝাঁপানো চুল তোমার। তার পর তুমি যা মেয়ে মা, খাটো চুল হলে নিজেই খুলে দেখাতে। ভাল কথা রান্নাবান্না কর বলে যে অনুমান করেছি, ঠিক কিনা—

সীমা : (মৃদু হেসে) বুঝেছি রান্নাবান্নায় হাত কেমন জিজ্ঞেস করতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন। কিন্তু এর পরীক্ষা তো মুখে দেওয়া যায়না, ফরমাস মত রেঁধে—

ভবতারিণীও হেসে উঠলেন কথা শুনে। তারপর বললেন : ঠিক জবাব দিয়েছ মা ! বেশ, ভগবান দিন দেন যদি—এ পরীক্ষা নেব বৈকি ! যাক্, আমার আর জিজ্ঞেস করবার কিছু নেই।

মনোরমা দেবীর বড় মেয়ে উষা জিজ্ঞাসা করল : মেয়ে আপনার পছন্দ হল ?

ভবতারিণী : দেখা তো হল, হাওড়ায় ফিরে গিয়ে ভেবেচিন্তে এই হপ্তার মধ্যেই পাকা কথা জানাব।

এমন সময় পরিপাটিরূপে সেজেগুজে প্রজাপতির মতন ঘরের মধ্যে সুমিত্রা এসেই যুক্ত করে বলল : নমস্কার পিসিমা—

পিসিমা বলে এভাবে হঠাৎ সম্বোধন করায় ভবতারিণী চমকে উঠে বললেন : ও ! চিনেছি। তা, তুমি যে এখানে ?

সুমিত্রা : (হাসতে হাসতে) এখানকার ব্যাপারে আমিই যে মূলাধার তা বুঝি জানেন না ? সীমার রং কালো বলে ওর হয়ে আমাকেই যে প্রক্সি দিতে হয়েছিল—তাতেই না আপনার ভাইপোর মাথা ঘুরে যায়।

ভবসুন্দরী ঃ ভদ্রলোকের বাড়ী এসে গায়ে পড়ে এসব কি বলছ তুমি ?

সুমিত্রা ঃ ভদ্রলোকের পীড়াপীড়িতে ভদ্রকন্যাকে যে কাজ করতে হয়েছিল—তাই বলছি—এতে বেজার হবার তো কিছু নেই। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হলনা—যার জন্যে নাম ভাঁড়ালাম, সেই দিলে চিচিং ফাঁক করে—মায় আমার পাত্তা পর্যন্ত। তাই তো আপনার ভাইপোর সঙ্গে ডাইরেক্ট আলাপ পরিচয় হয়।

ভবতারিণী ঃ হুঁ! এখন সব বুঝতে পেরেছি। তা তুমি কি এই সব কথা শোনাবার জন্যেই বালিগঞ্জ থেকে ব্যারাকপুরে এসেছ ?

সুমিত্রা ঃ না, ওসব তো কথার পিঠের কথা। আমি এসেছি নালিশ নিয়ে।

ভবতারিণী ঃ কিসের নালিশ ?

সুমিত্রা ঃ বিশ্বাসভঙ্গের। ভদ্রঘরের কুমারী কন্যার প্রতি অত্যাচারের।

ভবতারিণী ঃ কে এসব করেছে ?

সুমিত্রা ঃ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীবাবু।

ভবতারিণী ঃ আমি এ কথা বিশ্বাস করিনা। অবনী যে বংশের ছেলে, সেখানে এ পর্যন্ত কখনো কোনো কলঙ্কের দাগ পড়েনি। এসব নোংরা কাজ সে করতে পারেনা।

সুমিত্রা ঃ আমার সাক্ষী আছে। তারাও ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ে। একদিন নয়, দুদিন নয়, দিনের পর দিন—অবনী আমাকে মোটরে নিয়ে বেড়িয়েছে, আমাকে নিয়ে—

ভবতারিণী ঃ চুপ কর। এ সব কথা বলতে তোমার মুখ পুড়ছে না, কিন্তু আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে।

সুমিত্রা ঃ মুখ পুড়লেও আমাকে এখন সইতে হবে। এরপর আদালতের বিচারে যে দিন জিৎ হবে, তখন আপনাদেরই মুখ সব পুড়বে।

ভবতারিণী : তুমি এখন কি চাও ?

সুমিত্রা : যে কথা আমাদের মধ্যে হয়েছিল, সেটা যাতে সত্যি হয়, বাস্তব হয়, তাই আমি চাই। আমাকে বিয়ে করবার কথা দিয়ে আবার এখানে কনে দেখবার জন্যে আপনাকে পাঠিয়েছে—আর আমি তা সহ্য করব ভেবেছেন ?

ভবতারিণী : বেশ, আমি মা, আমাকেই এর বিচার করতে হবে। আর সে বিচার এইখানেই করব আসছে রবিবার। অবনী তার বন্ধুদের নিয়ে আসবে, তুমিও তোমার সাক্ষীসাবুদ সব এনো! এ মামলার বিচার আগে করে তার পর অন্য কথা! (মনোরমাকে লক্ষ্য করে) আমরা তাহলে এখন উঠি। রবিবার আবার আসছি। (সীমাকে লক্ষ্য করে) কিছু বলবে মা ?

সীমা : আমার মুখ দেখেই মনের কথা আপনি যখন জেনেছেন মা, তখন আপনার কাছে আমি শুধু এই প্রার্থনাই করছি—আমার বাপ-মাকে যখন দেখেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে ঐ দিন সবার সামনে শুধু আপনি এই কথাটি জানিয়ে দিন—সত্যিই তাঁরা কি ছিলেন ? জ্ঞান হয়ে অবধি শুনে আসছি—সর্বহারা দেনাদার হা-ঘরের মেয়ে আমি, আপনিই সন্ধান করে সত্য পরিচয় ওঁদের জানিয়ে দিন···এর বেশি আমি আর কিছু চাইনা।

ভবতারিণী : তাই হবে মা। এ ভার আমি নিলাম।

(৩৯)

তারকনাথের বাড়ির বৈঠকখানায় পরামর্শ-সভা বসেছে। নিরুপমা দেবী, সুমিত্রা, সুমিত্রার বন্ধু-বান্ধবীর দল সকলেই উপস্থিত। কেবল গৃহস্বামী তারকনাথকে দেখা যাচ্ছেনা। বৈঠকে রীতিমত একটা উত্তেজনার প্রবাহ বইছে। সুমিত্রার জন্মতিথির উৎসব রাত্রে অবনী

যখন সুমিত্রাকে উপহার দেবার জন্য হীরার দুল বের করে তার বান্ধবীদের অনুরোধে স্বহস্তে তার কানে পরিয়ে দেয়—সেই সময়কার ফটো অবনীর অলক্ষ্যে তোলা হয়েছিল।

যদিও ছবি ভাল ওঠেনি, তথাপি সেখানা দেখে অবনী ও সুমিত্রাকে চেনা যায় এবং অবনী যে সাগ্রহে তার কানে দুল পরাচ্ছে, সে দৃশ্যটা প্রকাশ পায়। নিরুপমা দেবী নিবিষ্ট মনে ফটোখানা দেখছেন, আর সকলের দৃষ্টি সেই দিকেই নিবদ্ধ। গৃহকর্ত্রীর অভিমত জানবার জন্য সবাই ব্যগ্র। এই অবস্থায় দৃঢ় স্বরে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করলেন হ্যাঁ, এর আর মার নেই। নির্মল, তুমি বাবা সত্যিকার কাজের ছেলে, ঘরশুদ্ধ সকলে যখন হৈ হুলোড়ে মত্ত, তুমি সেই সময় চুপি চুপি ক্যামেরা চালিয়ে আসল কাজটিই সেরে রেখেছিলে। এই ফটো দেখলেই বাছাধনের মাথা ঘুরে যাবে।

নির্মল ঃ ওটা আমার হবি। নেমন্তন্নে গেলেই ক্যামেরাকে কাজে লাগাই। এতেই আমার ভারি আনন্দ কাকিমা। তবে ওদিনের ব্যাপারে আসামী ক্যামেরায় ধরা পড়ে আমাদের কেস্‌টার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। এর জন্যে আমি কিন্তু—

সুমিত্রা ঃ খুব বড় রকমের একটা ধন্যবাদ দাবি করতে পারো।

নির্মল ঃ শুধু ধন্যবাদে তো পেট ভরবে না। আমার একটা লাভজনক প্রস্তাব আছে।

সুশীল ঃ প্রস্তাবের প্রসঙ্গ উঠলেই কিন্তু ভয় করে।

নির্মল ঃ মাভৈ ? আমার প্রস্তাব শুনলেই আহ্লাদে লাফিয়ে উঠবে। তবে বলেই ফেলি প্রস্তাবটা। অবনীবাবু মস্ত বড়লোক, নাম আছে, টাকা আছে, ইজ্জত আছে। যদি সুমিত্রা দেবীকে বিয়ে করতে রাজী থাকে তো কোন কথা নেই, নতুবা অন্ততঃ লাখ টাকা তার কাছ থেকে খেসারত আদায় করা চাই। সেই টাকায় সুমিত্রা দেবীর নামে একটা ফিল্ম-প্রতিষ্ঠান খোলা হবে—উনিই হবেন প্রোডিউসার।

প্রস্তাবটি শুনেই বন্ধু-বান্ধবীরা করতালি দিয়ে তাদের সমর্থন জানাল —বিপুল উল্লাসে ঘরখানা কেঁপে উঠল। সুমিত্রা ও হাসিমুখে বলল : অবনী যখন নির্মলের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, তার আর নিষ্কৃতি নেই। এর ওপর বিয়ের বাঁধন যদি পরে, সিনেমায় ওকে নামাবই—তাতে তোমরা সবাই চান্স পাবে। আর যদি একান্তই বাঁধনটা ফস্কে যায়—লাখ টাকা খেসারতটা কে ঘোচায়।

আবার সকলে করতালি দিয়ে সুমিত্রাকে উৎসাহ দিতে থাকে।

(৪০)

ক্ষেত্রনাথের বাড়ির বহির্মহলের সুবৃহৎ হলঘরে সীমার পাকা-দেখার ব্যবস্থা ও আয়োজন হয়েছে। শুধু পাকা-দেখা নয়, এই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক আরও কতিপয় সমস্যা সমাধানেরও আভাস পাওয়া গিয়াছে। ভবভারিণীদেবী ক্ষেত্রনাথকে জানিয়েছেন—অবনীর স্বর্গত পিতার নির্দেশমত আমিই তার জন্য উপযুক্ত পাত্রীনির্বাচনের অধিকারিনী। সেদিন আপনার ভাগিনেয়ী কল্যাণীয়া সীমাকে দেখে পছন্দ হওয়ায় আগামী রবিবার অপরাহ্নে দেখাটা পাকা করে আশীর্বাদের সঙ্কল্প করেছি। এই পাত্রী দেখার সংশ্রবে বিভিন্ন দিক দিয়ে যে-সব বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সেগুলির ও মীমাংসা প্রয়োজন। বিষয়গুলি আপনিও জ্ঞাত আছেন। সেগুলি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সুষ্ঠুভাবে মীমাংসা না হলে প্রস্তাবিত শুভকার্যটি সুশৃংখলে সম্পন্ন হতে পারেনা। এজন্য আমি সংশ্লিষ্টপক্ষকেও সংবাদ দিয়েছি। আপনার বাড়ির বাইরের ঘরে উক্ত বৈঠকের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির মীমাংসার পর আমারা কন্যাকে আশীর্বাদ করব।

সীমা পাত্রপক্ষের মনোনীত হওয়ায় ক্ষেত্রনাথ প্রসন্ন হতে পারেননি, পক্ষান্তরে পাত্রপক্ষের অভিভাবিকা ভবতারিণীদেবী সীমার পিতামাতার

সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতা জেনে অবধি তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। সুতরাং এই প্রতিপত্তিশালিনী নানা বিষয়ে অভিজ্ঞা মহিলাটি সম্বন্ধে খুবই সচেতন, তাঁর সম্মানের দিক দিয়ে পান থেকে চুনটুকুও খসাতে প্রস্তুত নন। এ অবস্থায় ভবতারিণীদেবীর নির্দেশগুলি আদেশের মতই পালন করেছেন।

তারকনাথবাবু এদিনের দেখাশোনার ব্যাপারে প্রথমে আসতে চাননি, কিন্তু পত্নী নিরুপমার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তাঁকে আসতে হয়েছে।—সঙ্গে নিরুপমা, কন্যা সুমিত্রা ও তার বন্ধু-বান্ধবীরা ও এসেছে।

ক্ষেত্রনাথ সকলকেই সাদর অভ্যর্থনা করেছেন। বাড়ির ভিতরে মেয়েদের বসানো হয়েছে! সুমিত্রার বন্ধুরা বাহিরের বৈঠখানায় বসেছে। সুমিত্রার সঙ্গে অবনীর ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে এরাই প্রধান সাক্ষী! ক্ষেত্রনাথবাবু সবই শুনেছেন, এমন কি, ঘটনাচক্রে বা সাক্ষীসাবুদের জোরে যদি সীমাকে বাতিল করে সুমিত্রাকেই পাত্রপক্ষ মনোনীত করেন, ক্ষেত্রনাথবাবুর পক্ষে সেটা অধিকতর বাঞ্ছনীয় হবে। তিনি এক্ষেত্রে তারকনাথকে স্পষ্টই বলেছেন: যদিও তুমি ভায়া ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার মতলব করেছিলে' তবুও আমি তার সমর্থন করেছি, আর—এখনো বলছি, তোমার মেয়ে সুমিত্রার সঙ্গে অবনীর বিবাহ হলে আমি বেশি খুশি হব। আগে যাই হোক, এখন আমার আন্তরিক ইচ্ছা—সীমা যাতে ও বাড়িতে বৌ হয়ে সেঁধুতে না পারে। যদি কোনরকমে এ সম্বন্ধটা ভেঙে যায়, তাহলে আমি একবার ওর সঙ্গে ভাল করে বোঝাপড়া করব—যদি সে জন্যে আমার ছেলে ভানুকেও পর করতে হয়, তাতেও পিছপা হব না।

ক্ষেত্রনাথের মুখে এই ধরনের কথা শুনে তারকনাথ ও তাঁর পক্ষের সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁদের বুঝতে বিলম্ব হয়না যে, মনের সমস্ত ক্ষোভ ও বিদ্বেষ ক্ষেত্রনাথ সবলে চেপে রেখেছেন

এবং বেচারী সীমাকেই যত নষ্টের গোড়া স্থির করে গুম হয়ে আছেন উপযুক্ত সুযোগ প্রতীক্ষায়।

সীমাও জেনেছে, সেই খাতার ব্যাপারে মামা-মামীর দুশ্চিন্তার শেষ নেই, এবং এর জন্য সীমাকেই দায়ী করে, মনে মনে তাঁরা যতই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, সীমার প্রতি তাঁদের আক্রোশ তত নিবিড় হয়ে উঠছে। কেবল মাত্র উপযুক্ত পুত্র এবং সীমার প্রতি একান্ত সহানুভূতিশীল ভানুর জন্যই প্রকাশ্যভাবে সীমাকে লাঞ্ছিত করতে নিরস্ত আছেন। তথাপি সীমা তার বাঁধাধরা নিয়মেই আগেকার মত দৈনন্দিন কাজগুলি সবই চালিয়ে যাচ্ছে নীরবে। এক ভানু ছাড়া বাড়ির সকলেই তার সঙ্গে কথা বন্ধ করেছে; সীমাকে কোন রকমে তার করণীয় কাজগুলি শেষ করে পড়া-শোনার ব্যাপারেও ভানুর মনোরঞ্জন করতে হচ্ছে।

সেদিনের অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে দুটি কথা সংশ্লিষ্ট মহলে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। প্রথম—সীমার পিতামাতার ঐশ্বর্য সম্পদ সম্বন্ধে ভবতরিণী দেবীর বর্ণনা। দ্বিতীয় ঘটনা—অবনীর বিরুদ্ধে সুমিত্রার অভিযোগ। ভানুর বিশ্বাস সুমিত্রা যে অভিযোগ করেছে-তা মিথ্যা; কারন, অবনী ও সুমিত্রা উভয়ের প্রকৃতির সঙ্গেই সে পরিচিত। পক্ষান্তরে, ভবতারিণী দেবী সীমার পিতামাতার সুখসৌভাগ্যের যে কাহিনী বলছেন, তাতে ভানু আরও আগ্রহশীল হয়ে ওঠে, একদিন সে হাওড়ায় অবনীদের বাড়িতে গিয়ে মুঙ্গেরের সংক্ষিপ্ত সংবাদটির উপর উজ্জল আলোকপাতের প্রস্তাব করে। প্রয়োজন হলে সে সীমার স্বার্থের জন্য মুঙ্গেরে গিয়ে তদন্ত করতে প্রস্তুত, এ কথাও সুস্পষ্টভাবে জানায়। সেই সূত্রে খাতার কথা চেপে রাখা আর অবনীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেই খাতাখানি ভানুর সৌজন্যে প্রাপ্তি ও তার উদ্ধারের রহস্যময় কাহিনী ভবতারিণী দেবী জানতে পারেন। ক্ষেত্রবাবুর মত স্বার্থপর ব্যক্তির পুত্র যে এমন সহৃদয় ওসদাশয় হতে পারে, এ যেন

ধারণাতীত ব্যাপার। সুতরাং ভবতারিণী দেবী সস্নেহে তাকে আদর -আপ্যায়নে গ্রহন করে মুঙ্গের সম্বন্ধে বহু প্রসঙ্গ তুলে সীমার সম্পর্কে এক প্রকার নিশ্চিন্ত করেন। তাই একদিন ভানু এক সময় সীমাকে নিভৃতে ডেকে নির্দেশ দেয়—সে যেন নিজেই সাদাসিধাভাবে সাজগোজ করে তার পড়ার ঘরে প্রতীক্ষা করে। কারও সঙ্গে মেলামেশার প্রয়োজন নেই, পরীক্ষা তার হয়ে গেছে, এখন শুধু ওই সুমিত্রা মেয়েটার অভিযোগ খণ্ডন হলেই সে হবে সর্বসুখী। সীমা শুধু মুখ তুলে বলে ঃ আমি যে হা-ঘরের মেয়ে নই' আমার বাবা ছিলেন লক্ষ্মীমন্ত পুণ্যাত্মা পুরুষ—সবাই জানলেই আমি হব সর্বসুখী।

ভানু ও সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠে ঃ তোমার বাবা যে কি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তোমাকে দেখে, আর তোমার কথা থেকেই সেটা বোঝা যায়। আমার মন বলছে' তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবেই।

বৈকাল ৪টা আন্দাজ আসবেন বলে ভবতারিণী দেবী জানিয়েছিলেন। এদিকে তিনটার আগে থেকেই ভিতর থেকে সুমিত্রা ও তার তিনটি বান্ধবীকে বাইরের ঘরে আহ্বান করে এনে তরুণ বন্ধুর দল নাচ-গানের মজলিস বসিয়ে দিল। পর পর তিনটি মেয়ের গান শেষ হলে সুমিত্রার পালা পড়ল। দলের মধ্যে নাচে তারই সুনাম থাকায় বন্ধুদের অনুরোধে তাকে নৃত্যের তালে তালে একখানি চটুল গান ধরতে হল। গানের বয়ান অনুসারে সুমিত্রা মালঞ্চ মধ্যে ফুলরাণীর ভুমিকায় মধুলুব্ধ মত্ত ভ্রমরদের আক্রমন থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে অথচ তার মুখে চোখে কামনার শিখা! এহেন চটুল লাস্যলীলা এমন এক রসঘন পরিস্থিতির সৃষ্টি করল যে, তিনটি তরুণী বান্ধবী ও পঞ্চ তরুণ বন্ধু ফরাসের উপর দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে নৃত্যশীলা সুমিত্রাকে ঘিরে

উদ্দাম ভঙ্গিতে. নাচের সঙ্গে বিভিন্ন কণ্ঠে গানের ঝঙ্কার তোলায় বাড়ির সামনে রীতিমত একটা ভীড় জমে উঠল।

এই হুল্লোড়ের সময় উর্দীপরা জনৈক চাপরাসী দুই হাতে পথের ভীড় সরিয়ে সৌম্যমূর্তি এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও তিনটি প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলাকে অতিকষ্টে বৈঠক ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে দিল। মহিলাদের মধ্যে প্রথমেই ছিলেন ভবতারিণীদেবী। পরিধানে শুভ্রবসন' দীর্ঘবহরের একখানি রেশমী চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত। তাঁর দুই সঙ্গিনীর পরিচ্ছদও তাঁর অনুরূপ।

জ্বলন্ত আগুনের উপর অকস্মাৎ প্রবল বারিবর্ষণ হলে তার যে অবস্থা হয়, বৈঠকঘরে উল্লাস প্রমত্ত তরুণ-তরুণীদের উদ্দাম লাস্যলীলা সেই ভাবে সাহসা স্তব্ধ হয়ে গেল দরজার সম্মুখে বিশিষ্ট পরিচ্ছদধারী গম্ভীরমূর্তি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটির সঙ্গে ভদ্রমহিলাত্রয়কে উপস্থিত দেখে।

ভবতারিণী দেবী বৈঠকখানার ব্যাপারটির সুযোগ নিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গী পুরুষটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন: মাঝখানের ঐ ফরসা মেয়েটিই সুমিত্রা—যার নালিশটার বিচার করবার জন্যই আপনাকে এনেছি মুখুজ্যেমশাই! এরই মধ্যে খবরটা এই ভাবে ভিতরে গিয়ে পৌছেছিল—আদালতের এক পেয়াদা সঙ্গে করে কারা এসেছেন বাইরের ঘরে।

ভিতরে একখানা নিভৃত ঘরের মধ্যে ক্ষেত্রনাথ, তারকবাবু, মনোরমা ও নিরুপমা এদিনের ফয়সলা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

পেয়াদার নাম শুনেই ক্ষেত্রনাথ উঠে পড়লেন, তারকনাথও বন্ধুর অনুবর্তী হলেন।

বিষয়-কর্ম উপলক্ষে মহানগীর বিভিন্ন আদালতেই ক্ষেত্রনাথের গতিবিধি থাকায়, বাইরে এসে এক নজরে সেই সম্ভ্রান্ত পুরুষটিকে দেখেই মহামান্য বিচারপতি স্যার মুখার্জি সাহেবকে চিনতে পেরে শিউরে

উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদেহটাকে কুব্জ করে নত হয়ে সসম্ভ্রমে অভিবাদনের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন : একি! হুজুর ! ধর্মাবতার! আপনি—

ভবতারিণী মৃদুস্বরে বললেন : ইনিই,এ বাড়ির কর্তা ক্ষেত্রবাবু, সীমার মামা।

তারকনাথ বেশ কিছু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন । কিন্তু আরদালীর চাপরাশের খোদিত লেখাগুলি পড়েই তাঁর চক্ষুস্থির। একি কাণ্ড! হাইকোর্টের জজ নিজে এখানে এসেছেন। তিনিও দূর থেকে ক্ষেত্রবাবুর অনুকরণে সভয়ে অভিবাদন করে সুধালেন : ধর্মাবতার কি তাহলে এখানেই বিচার করবেন? ভবতারিণী দেবী তারকনাথের পরিচয়প্রসঙ্গে বললেন : ক্ষেত্রবাবুর বন্ধু, আর—ঐ সুমিত্রা মেয়েটির বাবা।

স্যার মুখার্জি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর ভঙ্গিতে দুই প্রৌঢ় অভিভাবককে লক্ষ্য করে তিক্তস্বরে বললেন : আপনারা কি এতক্ষণ বাড়ির মধ্যে নিদ্রা দিচ্ছিলেন—বাইরের ঘরের বিশ্রী হুল্লোড়টার শব্দও কি কানে যায়নি? নিশ্চয়ই এটা ভদ্রপল্লী—

দুই হাতের প্রকোষ্ঠ ঘন ঘন কচলাতে কচলাতে ক্ষেত্রনাথ বললেন আজ্ঞে ধর্মাবতার, ছেলেমেয়েদের আমোদ প্রমোদে আমরা আর—

শ্লেষের সুরে বিচারপতি মুখার্জি বললেন : চমৎকার! ধেড়ে ধেড়ে ছেলেমেয়ে বাইরের ঘরে হৈহুল্লোড় করছে, তামাসা দেখতে সামনের রাস্তায় লোক জমে গেছে, আর আপনারা দিব্যি নিশ্চিন্ত—বারণ করা ও প্রয়োজন মনে করেন নি যাক্—আপনি বিচারের কথা তুললেন না? এখন শুনুন—গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা সাপেক্ষে হাইকোর্টের বিচারপতিরা পশ্চিমবঙ্গের যে কোন স্থানে সাময়িকভাবে আদালত বসাতে পারেন। ঐ মেয়েটি—যাকে ঘিরে এখানে একটা বিশ্রী পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল—তারই একটা নালিশের বিচার করবার জন্য

আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। এই ঘরে বসেই আমাকে বিচার করতে হবে।

ক্ষেত্রবাবু তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে ফরাসের মধ্যস্থলটি নিজেই ঝেড়েঝুড়ে গুটিয়ে রাখা কার্পেটখানা বিছিয়ে দিলেন। আসে পাশে কতিপয় তাকিয়াও এসে পড়ল। কয়েক মিনিটের মধ্যে একাজ শেষ করে তিনি স্যার মুখার্জিকে বসবার জন্য আহ্বান করলেন।

ভবতারিণী দেবী এই সময় বললেন: মুখুজ্যেমশাই, আপনি তো জানেন, আমরা কোনদিন বাইরের বৈঠকখানায় বসিনি, তাই ভিতরে যাচ্ছি।

স্যার মুখার্জি বললেন: তা হয়না, আজ এইখানেই আপনাদের বসতে হবে। বিশেষ করে, আপনার জবানবন্দীই প্রথমে যখন—

নিরুপমা দেবী এই সময় এগিয়ে এসে বললেন: বিচার যখন হবে ভাল করেই হোক, গোড়া থেকে সবই আমার জানা আছে, আমিই সব—

স্যার মুখার্জি: ইনি কে?

ভবতারিণী দেবী: সুমিত্রার মা।

স্যার মুখার্জি: আপনি এখন থামুন। ভবতারিণী দেবী অর্থাৎ অবনীর অভিভাবিকা আমাকে জানিয়েছেন, তিনি আগাগোড়া সব জেনেশুনে যথার্থ ঘটনাগুলি সবই বলবেন। যদি তাঁর কথায় কোন ভুলচুক থাকে, মিথ্যা মনে হয়, তখন আপনারা ইচ্ছামত প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু এঁর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, আপনারা কোন কথা বলবেন না—শুধুই শুনে যাবেন। আগেই আমি একথা জানিয়ে রাখছি। এখন আপনি আরম্ভ করুন—

ভবতারিণী দেবী বললেন: ঈশ্বরকে সাক্ষ্য রেখে আমি অঙ্গীকার করছি—আগাগোড়া সত্যই বলব। এইভাবে মুখবন্ধ করে তিনি

সীমাকে প্রথম দেখতে আসার দিন থেকে আরম্ভ করে, মেয়ে দেখে অবনীর পছন্দের কথা, তারপর বেনামা-পত্রে সুমিত্রাকে সীমা বলে চালাবার চেষ্টার কথা, কয়েকদিন পরে সুমিত্রা নিজেই গোপন ব্যাপারটা ভেঙে দেবার জন্য অবনীকে যে পত্র লেখে, সে পত্র আগাগোড়া পাঠ করে—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পার্কের পরিবর্তে সুমিত্রার বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে মেলামেশা এবং সেদিকে সুমিত্রার মায়ের প্রবল উৎসাহ দেওয়া প্রভৃতি ঘটনাগুলি গল্পের মত এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ করে শুনিয়ে দিলেন যে, সকলেই সাগ্রহে শুনতে লাগলেন। এরপর তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় একথাও জানালেন যে, সুমিত্রা মেয়েটি এরপর অবনীকে এমন ভাবে প্রলুব্ধ করে তোলে যে, তার প্রতি অবনীর কিছুটা মোহ জাগে। সুমিত্রার জন্মতিথিতে সে নিমন্ত্রিত হয়ে যোগ দেয়। অবনী তাঁর কাছে স্বীকার করে—ঐ উৎসবে সে নিজের হাতে পাঁচশো টাকা দামের দুটি দুল সুমিত্রার কানে পরিয়ে দেয়। এ ছাড়া আর কোন দিন সুমিত্রার অঙ্গস্পর্শও সে করেনি—সুমিত্রা বার বার তাকে প্রলুব্ধ করলেও সে এমন কোন কাজ করেনি, যাতে সুমিত্রার সম্ভ্রমহানি হতে পারে। এর পরেই সুমিত্রাকে তার বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড় করতে দেখে যে মোহ তার জেগেছিল সুমিত্রার প্রতি, তা ভেঙে যায়। এরপর সীমার সম্বন্ধে কতকগুলি খবর পেয়ে সীমার দিকেই অবনীর মন ঝুঁকতে থাকে। এ অবস্থায় অবনী ক্ষেত্রবাবুকে জানায় সে পুনরায় বন্ধুদের নিয়ে সীমাকে দেখবে। অন্য কোন বড়লোক পাত্র দেখতে আসছেন এই স্তোকবাক্যে সুমিত্রাকে ভুলিয়ে ক্ষেত্রবাবু আবার তাকে নিয়ে আসেন। কিন্তু আসরে আসতেই সব ফাঁস হয়ে যায়। তখন আর কোন আশা নেই দেখে, সুমিত্রা অবনীকে ভয় দেখিয়ে এক চিঠি লেখে। চিঠিখানি তিনি সবার সামনেই পড়ে শোনান। এই চিঠি পেয়ে অবনী আমাকে সব কথা বলে অনুরোধ করে, দুটি মেয়েকে দেখে আমি যাকে পছন্দ করব, সে নির্বিকারে তাকেই বিবাহ করবে। তখন আমাকেই

এ ব্যাপারে হাত দিতে হয়। প্রথমেই আমি সুমিত্রাকে দেখতে যাই।

এখানে তিনি সেদিনেই দেখা সম্বন্ধে সুমিত্রার সঙ্গে তাঁর আলাপের মোটামুটি মর্ম ব্যক্ত করলেন। এরপর সীমাকে দেখতে এসে সেখানেও সুমিত্রার উপস্থিতিতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, সে সবও উল্লেখ করে ভবতারিণী দেবী অবশেষে বললেন: অবনীকে আমি সুমিত্রার কথা বলতে সে ওর বাবার নামে শপথ করে বলে যে, দুল পরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন দিন সে সুমিত্রার অঙ্গস্পর্শ করেনি—যদিও সুমিত্রা তাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করেছিল। অথচ সুমিত্রা আমার মুখের ওপর জোর গলায় বলেছে—অবনীর সন্তান সে গর্ভে ধারণ করেছে। অবনীর পক্ষে আমার বলবার আর কিছু নেই, আমি তাকে বিশ্বাস করি, সে কখনো মিথ্যা বলবে না।

নিরুপমা দেবী সেই সময় ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: আপনার ভাইপোর আর গুণ ব্যাখ্যানা করবেন না। সে যে কাণ্ড করেছে আমার মেয়েকে নিয়ে, মেয়ের বন্ধুরা তার ছবি তুলে নিয়েছে। দেখাও তো বাবা নির্মল—সুমিত্রার কানে দুল পরানোর সেই ছবিটা—

স্যার মুখার্জি বললেন: থাক, ইনি আগেই সে কথা বলেছেন। সে ছবি দেখাবার কোন প্রয়োজন নেই। এখন কথা হচ্ছে, সুমিত্রা অবনীর বিরুদ্ধে যে বিশ্রী ব্যাপারটি নিয়ে তার পিসিমার কাছে নালিশ করেছে, তারই সম্বন্ধে এখন বিচার বিবেচনা প্রয়োজন। আমি স্থির করেছি, লোক্যাল পুলিসের হেফাজতে সুমিত্রাকে পি. জি. হাসপাতালে ফিমেল ওআর্ডে পাঠিয়ে দিয়ে স্পেশালিস্ট দিয়ে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

স্যার মুখার্জির এই কঠোর মন্তব্য শুনেই সুমিত্রা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। বিচারপতি গম্ভীরভাবে তার দিকে তাকাতেই সে

কান্নায় ভেঙে পড়ার মত হয়ে বলল : না, না আমাকে হাসপাতালে পাঠাবেন : না, আমি পিসিমাকে যে কথা বলেছি, তা সত্যি নয়। অবনীবাবু আমাকে আশা দিয়ে নিরাশ করাতেই আমি তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য পিসিমার কাছে ওকথা বলেছিলাম। এর জন্যে আমি মাপ চাইছি।

এভাবে যে এতবড় একটা জটিল সমস্যার মীমাংসা হবে, কেউ বুঝি সেটা কল্পনাও করেনি। পুলিস আর হাসপাতালের নামেই সুমিত্রার মত বাচাল মেয়ের সমস্ত মনোবল ভেঙে গেল। নিরুপমা দেবী মুখখানা বিকৃত করে মেয়ের উদ্দেশ্যে চাপা গলায় অনেক কিছুই বললেন। সত্যকথা বলতে কি, তারকবাবু বুঝি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

স্যার মুখ্যার্জি গাঢ় স্বরে বললেন : এই শ্রেণীর এঁচড়ে-পাকা মেয়েরা আমাদের সমাজের ব্যাধি স্বরূপ হয়েছে। বাপ-মার দোষেই এটা হয়ে থাকে। এখন অবনী ইচ্ছা করলে পাল্টা অভিযোগ তুলে এর প্রতিশোধ নিতে পারে।

স্নিগ্ধ স্বরে ভবতারিণী দেবী বললেন : তার আর প্রয়োজন হবে না। অবনীর মুখে আমি শুনেছি, সুমিত্রার বাপের কোন হাত ছিল না মেয়ের ওপর। তিনিই নাকি অবনীকে সীমার সত্যকার পরিচয় দেন, নৈলে সীমা বেচারী আড়ালেই পড়ে থাকত। যাই হোক, আমি এখানে কথা দিচ্ছি, সুমিত্রা যদি এরপর তাঁরই মনোনীত কোন সুপাত্রকে বিবাহ করতে রাজী থাকে, তাহলে আমি তাঁর হাতে সুমিত্রার বিবাহ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত রইলাম।

আসরে একটা আনন্দময় গুঞ্জন উঠল। একটু পরেই ভবতারিণী দেবী বললেন : গোড়ার হাঙ্গামাটা যখন মিটে গেল, এখন সীমাকে এখানে আনা হোক, আমরা আশীর্বাদ করব।

খানিক পরেই ভানু সীমাকে এনে আসরে স্যার মুখ্যার্জি ও ভবতারিণীর সামনে বসিয়ে দিল। সীমা সভাস্থ গুরুজন প্রত্যককে প্রণাম করেই ভবতারিণীকে বলল: আপনি একটা বিশ্রী ব্যাপারের মীমাংসা করে যেমন অনেকের মুখ রক্ষা করেছেন, তেমনি—আমি আপনার কাছে যে ভিক্ষা চেয়েছিলাম—সীমার কথায় বাধা দিয়ে সস্নেহে তার চিবুকটি ধরে ভবতারিণী দেবী বললেন: সেকথা আমার মনে মনে আছে মা! আগে সে দিক দিয়ে তোমার মুখ রক্ষা করে তবে আমরা তোমাকে ধান-দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করব।

এর পর ভবতারিণী দেবী মুঙ্গের প্রসঙ্গ তুলে বললেন: যদিও মুঙ্গেরে আমাদের যে জমিদারি ছিল, তা আজ সরকারের হাতে গেছে, কিন্তু সেরেস্তার দরকারী খাতাপত্র সব আমার পক্ষে এসেছে। সেই খাতাপত্র থেকে এই হিসেব পেয়েছি, ক্ষেত্রবাবু, আপনিও শুনুন। ইচ্ছা করলে হাওড়ায় আমাদের বাড়িতে গিয়ে সে সব হিসেব খাতা দেখে পরীক্ষা করতে পারেন। এখন শুনুন—সীমার বাবা উপেনবাবু অভ্রের কারবারে ফেঁপে ওঠেন। কিন্তু ক্রমে ঐ কারবারে মন্দা পড়ায় তিনি অভ্রের খনি সব বিক্রী করে কোলিয়ারি কেনবার সঙ্কল্প করেন। আমরা তাঁহাকে সাহায্য করতে সম্মত হই। অভ্রের খনিগুলি বিক্রী করে তিন লাখ টাকা তিনি ঘরে তুলে আনেন, এক লাখ টাকা আমাদের সেরাস্তায় জমা দেন কোলিয়ারি কেনবার জন্য। তারপরই প্লেগের হিড়িক আসে, আমরা কাশী চলে যাই, তিনি পরে যাবেন কথা থাকে। তারপর সেই প্লেগই নিয়তি হয়ে একদিনের আড়াআড়িতে স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই পরপারে পাঠিয়ে দেয়। খাতার হিসেব থেকে খুব সহজেই প্রমাণ করা যায়—যেদিন নগদ তিনলাখ টাকা ঘরে আনেন, তার তিনদিনের মধ্যেই তাঁদের দেহান্ত হয়, আর, আপনি তখন তাঁরই কাছে নিজের দড়ির কারবার ফলাও করবার জন্যে কিছু টাকা ধার করতে যান। সাত দিনের মধ্যেই উপেনবাবুর যথাসর্বস্ব

জলের দরে বিক্রী করে তাঁর এই মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। এর আট মাস পরে মুঙ্গেরে আমরা ফিরে এসে জানতে পারি উপেনবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যথাসর্বস্ব বিক্রী হয়ে গেছে। অথচ আমাদের সেরাস্তায় যে লাখ টাকা জমা আছে, সে কথা কেউ জানেনা, কেউ দাবীও করেনা। আমরা অগত্যা সেই টাকায় উপেনবাবুর হিসাবেই একটা কোলিয়ারি কিনে চালাতে থাকি। এখনো সে কোলিয়ারি চলছে, আর এতগুলো বছরে তার লাভও হয়েছে প্রচুর—মোটামুটি হিসাবে জেনেছি, প্রায় পাঁচ লাখের কাছাকাছি। এর মালিক এখন উপেনবাবুর মেয়ে ভাগ্যবতী এই সীমা। তাহলেই সকলে বুঝুন, সীমাকে যারা হা-ঘরের মেয়ে, মামার অন্নে পালিতা বলে ভাবতেন, এখন সেটা উল্টে যাচ্ছে। ক্ষেত্রবাবু খাতায় যা লিখেছিলেন, খেয়ালের বসে নয়—ধর্মের ইশারায়, আর তার প্রতিটি অক্ষর সত্যি। তাহলে আমার কথা হচ্ছে—সীমা বনেদী ধনীর কন্যা, তারই বাপের ঐশ্বর্যে ক্ষেত্রবাবুর এই প্রতিষ্ঠা। সীমা এখন ইচ্ছা করলে সেটাকে দাবী করতে পারে।

ভবতারিণী দেবীর কথাগুলি শুনতে শুনতেই ক্ষেত্রবাবুর সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাতে, বুকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করে তিনি দু'হাতে বুকখানা চেপে ফরাসের এক পাশে বসে পড়েন। এ অবস্থায় সীমা তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর সামনে গিয়ে দু'হাতে বুকটা ডলে দিতে দিতে আর্তস্বরে বলে উঠল: মামার এ রোগটা ইদানিং হয়েছে—মনে আঘাত পেলেই ভেঙে পড়েন।

সকলেই নির্বাক দৃষ্টিতে মুমূর্ষু মামার শুশ্রূষাপরায়ণা ভাগ্নীর দিকে তাকিয়ে থাকে। অল্পক্ষণের পরিচর্যায় ক্ষেত্রনাথ একটু প্রকৃতিস্থ হলেই, সীমা পুনরায় তার স্থানে ফিরে গিয়ে ভবতারিণী দেবীর সামনে বসে যুক্তকরে গাঢ়স্বরে বলল: মাগো, আপনি আমার মস্ত উপকার

করেছেন, আপনার জন্যই আমি আবার বুঝি জাতে উঠেছি, আমি জেনেছি যে, হা-ঘরের মেয়ে আমি নই, আমার বাবা ছিলেন সত্যিকার বৃত্তকণ, লক্ষ্মীমন্ত, পরোপকারী মহাপুরুষ। এতেই আমি ধন্য হয়েছি মা। কিন্তু বাবার সে সম্পত্তির ওপর আমার কোন লোভ নেই। মামা যদি আমাকে সে দুর্দিনে আশ্রয় না দিতেন, কোথায় থাকতাম আমি—চোর ডাকাতে সব লুটেপুটে নিতো। মামার কৃপাতেই আমি এত বড় হয়েছি, শিক্ষা পেয়েছি, বিচার বিবেচনা শিখেছি। মামা তাঁর সম্পত্তি নিয়ে সুখে থাকুন, ওদিকে যেন আমার লোভের দৃষ্টি না পড়ে। তাহলেই আমি সুখী হব।

সীমার শেষের কথাগুলি অশ্রুর আবর্তে গাঢ় হয়ে ওঠে। ভবতারিণী দেবীর চোখদুটিও অশ্রুর শাসন রোধ করতে পারে না। সাশ্রুনয়নে তিনি পরমাত্মীয় স্যার মুখ্যার্জিকে বললেন: মুখুজ্যে মশাই, এখন আপনিই বলুন, আমার বধু-নির্বাচন ঠিক হয়েছে কিনা?

গাঢ়স্বরে স্যার মুখার্জির বললেন: আমার মনে হয় প্রথম দিন ক্ষেত্রবাবু যদি সীমার গায়ে ময়লা রঙ ঢাকবার জন্যে অন্যায়ের আশ্রয় না নিতেন, অবনীর মত চক্ষুস্মান ছেলে এ মেয়েকে দেখেই পছন্দ করত। এতো আর ঝড়ের জোনাকি নয়, সত্যকার রূপসী মেয়ে, এরাই ভুবন আলো করে রূপের আভায়। এখন এ কন্যাকে আশীর্বাদ কর।

॥ শেষ ॥